

মহামতি রাম ফাঁসুড়ে

প্র. না. বি.

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মহামতি রাম ফাঁস্‌তুড়ে

শিক্ষা

মহামতি রাম ফাঁসুড়ে ওরফে রামলোচন চক্রবর্ত্তী (মতান্তরে রামলোচন সেন) বাংলা দেশের একজন বিস্মৃতপ্রায় মহাপুরুষ। তিনি কখন্, বাংলাদেশের কোন্ অঞ্চলে জন্মিয়াছিলেন কিছুই জানা যায় না। কিম্বদন্তীমূলে লোকে অনুমান করিয়া থাকে যে তিনি যশোহর জেলায় কিংবা বাঁকুড়া বা বর্দ্ধমানের কোন স্থানে জন্মিয়া থাকিবেন। তাঁহার পিতৃকুল সম্বন্ধেও কিছুই প্রায় জানা যায় না। এখানেও কিম্বদন্তী একমাত্র ভরসা। কিম্বদন্তী বলিতেছে যে, তাঁহার পিতা সেকালের একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার টোল ছিল। সেই টোলে নানাদেশ হইতে ছাত্র আসিত। তাঁহার খ্যাতি যে বাংলাদেশের বাহিরেও প্রসারিত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা অন্যায় হইবে না। কেননা, অন্ততঃ একজন কাশীর ছাত্রের কথা জানিতে পারা যায়। উক্ত কাশীবাসী ছাত্রের সহিত রাম ফাঁসুড়ের জীবনকাহিনী জড়িত।

মহামতি রাম ফাঁসুড়ে বাল্যকালে অনেক ভাবী মহাপুরুষের ন্যায় দুরন্ত ছিলেন। পড়াশুনা কিছুই করিতেন না, পাড়া-পড়শীকে উত্ত্যক্ত করিয়া সময় কাটাইতেন। এই সময়

একজন প্রতিবেশী রাম ফাঁস্থড়ের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে 'বামুনের এঁড়ে' বলিয়া গালি দেয়। ইহাতেই বালক রামের মতিগতির পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, তাঁহার পিতা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অথচ তিনি মূর্খ—'বামুনের এঁড়ে' গালাগালির ইহাই মর্ম্ম। তখন তিনি পিতার কাছে আসিয়া জানান যে তিনি টোলে পড়িবেন। পিতা একমাত্র সন্তানের আগ্রহে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে টোলে ভর্ত্তি করিয়া লন। এইবারে রামের প্রতিভার স্ফুরণ সুরু হইল। তিনি মাত্র পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে ব্যাকরণ, সাহিত্য, ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি শেষ করিয়া ফেলিলেন। পিতা বুঝিলেন যে পুত্র সুসন্তান। তখন রাম পিতার কাছে নিবেদন করিলেন যে তিনি কাশীতে বেদান্ত পড়িতে যাইবেন। সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত কাশীবাসী ছাত্রের অধ্যয়ন শেষ হওয়াতে তিনি দেশে ফিরিতেছিলেন, রাম তাঁহার সঙ্গ লইলেন। তখনকার দিনে * কাশীর পথ দুর্গম ছিল—সমস্তটা পথ পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না; নৌপথে যাতায়াত চলিত, কিন্তু তাহা ব্যয়সাধ্য। পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া পিতা পুত্রকে কাশী যাইবার অনুমতি দিলেন। উক্ত ছাত্রের

* খুব সম্ভব মহামতি রাম ফাঁস্থড়ে অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধে জন্মিয়াছিলেন। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদকের কোন কোন সরকারী দলিল হইতে জানা যায় যে রাম তখনো জীবিত ছিলেন।

সঙ্গে রাম কাশীযাত্রা করিলেন। রাম কাশী পৌঁছিয়া অত্যল্প কালের মধ্যে বেদান্ত ও সেকালে জ্ঞাতব্য অন্যান্য শাস্ত্রও পড়িয়া ফেলিলেন। গুরু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দান করিলেন।

এই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞতাই রামের জীবনে আমুল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিল। শাস্ত্রের সামান্য অংশ পাঠেই কত জনের জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটে, আর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞতা যে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইবে তাহা খুবই সম্ভব।

সর্ব্বশাস্ত্রে বিশেষ শঙ্করভাষ্যে অসামান্য জ্ঞানের ফলে রাম বুঝিতে পারিলেন যে জগৎ ব্যাপারটাই মিথ্যা। সেই মূলসূত্র হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন যে মূল বিষয়টাই যদি মিথ্যা হয়, তবে তন্মধ্যে ছোট মিথ্যা, বড় মিথ্যা এবং মাঝারি মিথ্যা থাকিতে পারে না। অভূতপূর্ব্ব প্রতিভার বলে তিনি বুঝিয়া লইলেন যে জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তবে জগতের বিষয়ীভূত ধর্ম্ম, বিবেক, নীতি প্রভৃতিও সত্য হইতে পারে না। অনুমান করিলেন, তবু যে লোকে ঐ সব অনুসরণ করিয়া চলে তাহা তাহাদের অজ্ঞতা বা আংশিক জ্ঞানের ফল। শাস্ত্র অধ্যয়নের পূর্ব্বে তিনি যাহাই করুন না কেন, এখন আর সে পথে চলা যায় না, কেন না, তাহা হইলে শাস্ত্রের ফলশ্রুতি মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। পুণ্যপ্রবাহিণী গঙ্গাতীরে বসিয়া তিনি নিষ্কামভাবে মনে মনে এইসব চিন্তা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা-কমণ্ডলু নিঃসৃত যে সঞ্জীবনী নদী

তীরে কবীর, তুলসীদাস এবং প্রাচীনতর কালে আরও কত ব্রহ্মর্ষি কত বিচিত্র অধ্যাত্মসিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই গঙ্গাতীরে বসিয়াই তিনি আর একটি বিপ্লবকারী সিদ্ধান্ত করিলেন যে' সত্যমিথ্যা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ, নীতি দুর্নীতি কিছুই নাই, কারণ জগৎ যখন মিথ্যা তখন ঐ সবই মিথ্যা, আর ঐ সবে বিশ্বাস অজ্ঞতাজনিত ভ্রমমাত্র।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবামাত্র তিনি, কাশীর বিখ্যাত গুণ্ডা কুন্দনলালের আড্ডায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। কুন্দনলাল তখন বিবিধ মশলা সহযোগে সুগন্ধি সিদ্ধি পান করিতেছিল। যদিচ কেহ কাহাকেও চিনিত না, কিন্তু তাই বলিয়া আলাপের কোন বাধা* হইল না, কারণ মাদক দ্রব্য উদরসাৎ হইবামাত্র চিত্তে একপ্রকার সার্ব্বজনীন ভাব আনিয়া দেয়। সেই সার্ব্বজনীনতার বশীভূত হইয়া কুন্দনলাল একলোটা পানীয় নবাগতের দিকে অগ্রসর করিয়া দিল। সর্ব্বশাস্ত্র-পারঙ্গত মহামহোপাধ্যায় রাম ইহাকে একটা সুলক্ষণ বলিয়া মনে করিলেন—এবং পানীয়কে সাধনোচিত ধামে প্রেরণ করিলেন। তারপর সসঙ্কোচে নিজের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিলেন। কুন্দন সব শুনিয়া ঈষৎ আরক্ত নেত্রে, কিঞ্চিৎ গদ্‌গদ্‌ভাষে বলিলেন—এহি বাৎ সাচ্চা হ্যায়—

তখন মহামহোপাধ্যায় রামলোচন বেদান্তবাগীশ (যতদূর অনুমান হয় ইহাই তাঁহার পুরা নাম) শুধাইলেন, এখন কর্ত্তব্য কি?

কুন্দনলাল ঘূর্ণিত নয়নে, অঙ্গুলিতে একটি মুদ্রাবিশেষ করিয়া বলিল—

সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বতাওয়ে
জ্ঞান করে উপদেশ
তব কয়লাকো ময়লা ছুটে
যব······

দোঁহাটি সম্পূর্ণ হইবার আগেই কুন্দনলাল তাকিয়া আশ্রয় করিয়া ঢুলিয়া পড়িল—দোঁহা আর শেষ হইল না। অনেক মহাবাক্য আছে যাহা শেষ করিবার প্রয়োজন হয় না, আভাসমাত্রে তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়, বিশেষ রামলোচন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত।

রামলোচন পুনরপি শুধাইলেন—আচার্য্য, তেমন গুরু পাইব কোথায়?

কিন্তু আচার্য্যের মুখ হইতে উত্তরের পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে গুরুগুরু ধ্বনি আসিতে লাগিল।

রামলোচন বুঝিলেন আজ আর আশা নাই। তখন তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি সন্ধান পাইলেন না, আভাস পাইলেন, অনেকটা কলম্বসের আমেরিকা দর্শনের পূর্ব্বে সমুদ্র জলে ভগ্ন বৃক্ষশাখা দর্শনের মতন।

রামলোচন কুন্দনলালের গৃহ হইতে বাহির হইয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন যে লক্ষ্য স্থির হইয়াছে বটে, কিন্তু পথ কোথায় আর পথপ্রদর্শকই বা

কোথায়? তা ছাড়া জ্ঞানী লোক বলিয়া আরও একটা বিষয় তাঁহার মনে উদিত হইল। জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তই যদি সত্য হয়, তবে সার্ব্বজনীন ব্যবহারে তাহার পরিচয় পাওয়া দরকার। নতুবা তাঁহার ধারণাকে একটা সাধারণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হইবে না।

কাশীর সঙ্কীর্ণ গলিপথ, তখনো সন্ধ্যা হয় নাই। এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে কাশীর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ত্রিভুবন দাস গৃহ হইতে গৃহান্তরে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, অধিকাংশ স্থানেই উপদেশ ছাড়া কিছু পাইতেছে না। তিনি আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে কাশীর একজন কুখ্যাত ধনী রামস্বরূপ বাড়ীর বারান্দায় দরবার জাঁকাইয়া বসিয়া আছে—আর সম্মুখে কত গুণী জ্ঞানী নতজানু হইয়া বসিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা পাইতেছে।

এই দুটি ভিন্ন রসাত্মক দৃশ্য দেখিবামাত্র তুলসীদাসের সেই বিখ্যাত দোঁহাটি রামলোচনের মনে পড়িল—

গোরস গলি গলি ফিরি
সুরা বৈঠল বিকায়।

রামলোচন বুঝিলেন যে তুলসী একজন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ। তখন তিনি তুলসীদাসের দোঁহাবলী মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে করিতে চলিলেন। কাশীতে আসিয়া অতিরিক্ত পাঠ্যরূপে তিনি তুলসীদাস ও কবীরের দোঁহাবলী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

আরও কিছুদূরে অগ্রসর হইতেই রামলোচন দেখিলেন যে পথের পাশে একটি ভিড় জমিয়াছে। কৌতূহলী হইয়া সন্ধান লইয়া জানিলেন যে একজন গৃহস্থের বাড়ীতে চোর ঢুকিয়াছিল। চোর ধরা পড়িবামাত্র লোক জুটিয়া গিয়া চোরকে ছাড়াইয়া লইয়া গৃহস্থকে মারিতে সুরু করিল। গৃহস্থের অপরাধ সে কেন দরজা খোলা রাখিয়াছিল। গৃহস্থের প্রতিবেশী ক্ষমা করিতে বলিলে সকলে তাহাকেও ধরিয়া মারিল।

এই ঘটনা জানিবামাত্র তুলসীর আর একটি দোঁহা রামলোচনের স্মৃতিতে জাগিল ঃ—

জহাঁ ধর্ম্ম তহাঁ ধর্ম্ম হ্যায়
জহাঁ লোভ তহঁ পাপ।
জহাঁ ক্রোধ তহঁ কাল হ্যায়,
জহাঁ ক্ষমা তঁহ আপ।

রামলোচন এতক্ষণে প্রসিদ্ধ দোঁহাটির প্রকৃত অর্থ বুঝিলেন। এতদিন ভুল অর্থ বুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিলেন যে তত্ত্বজ্ঞ তুলসী ধর্ম্ম ও ক্ষমাকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন এবং পাপ ও ক্রোধকে বাঞ্ছনীয় ঘোষণা করিয়াছেন। তখন তাঁহার কাছে অন্ধকার পথ কিঞ্চিৎ আলোকিত হইল। তিনি মনে মনে হাসিলেন, হায় হায় মানুষে প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া শাস্ত্রের কি কদর্থই না করে। তিনি স্থির করিলেন যাবতীয় শাস্ত্র-গ্রন্থের একটি রামলোচনী টীকা রচনা করিবেন, লোকে যাহাতে প্রকৃত পথের সন্ধান পাইতে পারে। কারণ তিনি

ইতিমধ্যেই দিব্য প্রতিভা বলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে শাস্ত্রের প্রচলিত কদর্থই যথার্থ মুক্তি-পথ দর্শনের একটি প্রধান অন্তরায়।

পরদিন রামলোচন আবার কুন্দনলালের গৃহে গেলেন, বলিলেন—আচার্য্য, আমার কি গুরু মিলিবে না?

কুন্দন বলিল—গুরু ভাগ্যে মেলে; তোমার ভাগ্য যখন প্রসন্ন হইবে, গুরু অবশ্যই মিলিবে।

তারপরে বলিল—তুমি এখন দেশে যাও। দেশই সকলের কর্ম্মস্থান হওয়া উচিত। কেন না, হাজার হাজার স্বভাষী ও স্বদেশবাসীর মধ্যে ধরা পড়িবার আশঙ্কা কম, তা ছাড়া প্রত্যেকেরই স্বদেশের প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে; যাহারা স্বদেশের দাবী মিটাইতে সক্ষম হয়, বিদেশের সেবা করিবার গৌরব তাহাদেরই।

জিজ্ঞাসু রামলোচন শুধাইলেন—আমার সাধনপন্থা কি হইবে?

কুন্দন বলিল—মনের অভিপ্রায় যদি আন্তরিক হয়, সাধনপন্থার জন্য ভাবিতে হইবে না; আপনি পথ পাইবে, খুঁজিতে হইবে না।

কুন্দনের উপদেশে রামলোচন সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং পর দিন প্রত্যূষে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কয়েকদিন পথ চলিবার পরে রামলোচন এক গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অরণ্যটি শ্বাপদসঙ্কুল। সন্ধ্যা আসিবার আগেই বন পার হইতে হইবে ভাবিয়া রামলোচন দ্রুততর বেগে পথ চলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন তিনি বনের প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছেন তখন দেখিলেন একজন পথিক বনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

রামলোচন তাহাকে বলিলেন—তুমি এ কি করিতেছ? রাত্রে বনে ঢুকিতেছ—এ বন যে বাঘ ভালুকের আশ্রয়—

পথিক ললিল—সেই জন্যই তো প্রবেশ করিতেছি।

—কেন?

পথিক বলিল—আমার নাম খল-চূড়ামণি। বাঘে আমাকে ভক্ষণ করুক ইহাই আমার ইচ্ছা।

—হঠাৎ এইরূপ অদ্ভুত ইচ্ছা হইবার কারণ কি?

—বাঘ একবার নররক্তের স্বাদ পাইলে মানুষ ছাড়া আর কিছু খাইবে না।

—তাহাতে তোমার লাভ কি?

—লাভ এই যে মনুষ্য সমাজ উপদ্রুত হইবে। আমি মরিয়াও মানুষের ক্ষতি করিতে চাই, সেই জন্যই তো আমার নাম খলচূড়ামণি।

তাহার কথা শুনিয়া রামলোচন বুঝিলেন—এই পথিকই তাঁহার গুরু হইবার যোগ্য। এত শীঘ্র যে তাঁহার গুরু মিলিবে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

তখন তিনি পথিকের পায়ের কাছে পড়িয়া বলিলেন—প্রভু, আমি মুমুক্ষু, আমাকে দীক্ষা দিন ; আপনি আমার গুরু।

মংরু বলিল (উহাই পথিকের নাম)—ভাল, এক রাত্রির জন্য আত্মদান ক্ষান্ত রাখিলাম। চলো, আজ রাতটা দুজনে গাছের উপরে চড়িয়া কাটাই, আগামী কল্য দীক্ষা দিয়া বৃহত্তর হিতের উদ্দেশ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিব।

দুজনে একটা গাছে চড়িয়া রাত্রি কাটাইল। ভোরবেলা রামলোচন দেখিলেন মংরু নাই। কোথায় গেল? রামলোচন আরও দেখিলেন যে তাঁহার উত্তরীয় প্রান্তে কয়েকটি মুদ্রা ছিল তাহাও নাই ; বুঝিলেন, মাঝরাতে যখন একবার তন্দ্রা আসিয়াছিল তখনই মুদ্রা ও মংরু উভয়ে একযোগে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। রামলোচন ভাবিলেন, তা করে করুক, ওটা না হয় আমার গুরুপ্রণামী। আরও ভাবিলেন, আমার ভাগ্য যেমন প্রসন্ন ভাবিয়াছিলাম তেমন প্রসন্ন নয়, নতুবা গুরুর দেখা পাইয়াও দীক্ষা পাইলাম না কেন? তখন তিনি এই ভাবিয়া সান্ত্বনা পাইলেন যে দীক্ষা না পাই একবার দেখা তো পাইলাম। তিনি স্থির করিলেন, এখন হইতে মংরুকেই গুরুরূপে স্মরণ করিবেন। তখন তিনি মংরু মংরু জপিতে জপিতে গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন এবং কয়েকদিন পরেই নিরাপদে স্বগ্রামে আসিয়া উপনীত ইহলেন।

রামলোচনের পিতা বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেও তখনো জীবিত ছিলেন। এটি রামলোচনের তত ভালো লাগিল না ; কারণ, এখন তিনি মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিতচিত্ত একজন ভাবী মহাপুরুষ। সংসারে প্রায়ই দেখা যায় যে মহাপুরুষগণের মাহাত্ম্যলাভের পথের প্রথম ও প্রধান অন্তরায় পিতৃদেবগণ। তাঁহারা পুত্রকে পুত্র বলিয়াই মনে করেন, পুত্র পিতাদের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে—একথা স্বীকার করিতেই চান না। কাজেই ভাবী মহাপুরুষগণের প্রথম দ্বন্দ্ব বাধিয়া থাকে পিতাদের সহিত। কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন কি ভাবে সিদ্ধার্থকে কামকাঞ্চনের বেড়াজালে বদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলেই রামলোচনের সমস্যা খানিকটা বুঝিতে পারা যাইবে। তার উপরে রামলোচনের পিতা নিজেও একজন পরম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যে গতানুগতিক অর্থে শাস্ত্র বুঝিতেন রামলোচনের চিন্তিত অর্থ তাহা হইতে ভিন্ন। এক্ষেত্রেও দ্বন্দ্ব বাধিবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু ভরসার মধ্যে এই যে মানুষ অমর নয়—আর রামলোচনের পিতা বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এই সময়ে একটি ঘটনাতে রামলোচন অভীষ্ট পথের সন্ধান লাভ করিলেন। রামলোচনের পিতা একদিন পুত্রকে বলিলেন—রামু, আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি—কবে মরি স্থির নাই. চলো একবার শিষ্যদের সঙ্গে দেখা করিয়া আসি।

তখন দুই তিন দিন পরে পিতা ও পুত্র শিষ্যবাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পিতা বলিলেন, এই উপলক্ষে শিষ্যদের সঙ্গে পরিচয় হইবে—তুমিই তো তাহাদের বংশের ভাবী গুরু।

রামলোচনের শিষ্যদের অধিকাংশেরই বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়।

রামলোচনের পিতা পুত্রকে সঙ্গে লইয়া প্রায় মাসাবধিকাল এক শিষ্যের গৃহ হইতে অন্য শিষ্যের গৃহে ঘুরিলেন। ক্রমে তাঁহাদের দেশে ফিরিবার সময় হইল। শিষ্যদের দত্ত প্রণামীতে গুরু অনেকগুলি টাকা পাইয়াছিলেন।

বাড়ী ফিরিবার পথে দুইজনে একদিন মধ্যাহ্নে এক গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। গৃহস্থ তাঁহাদের বিশেষ সমাদর করিল—এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করিয়া দিল। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ রামলোচন পরান্ন গ্রহণ করেন না, তবে তণ্ডুলেন্ধন প্রভৃতি দিলে রাঁধিয়া খাইতে তাঁহার বাধা নাই।

রামলোচনের পিতা রাঁধিতে বসিয়াছেন—পুত্র স্নানে গিয়াছে, বাড়ীর কনিষ্ঠা বধূ বৃদ্ধকে সাহায্য করিতেছে; এটা করুন, ওটা শর্ষে বাটা, এইসব বলিতেছে, ঘরে আর কেহ নাই।

এমন সময়ে একবার এদিক ওদিক দেখিয়া লইয়া বধূটি বলিল, মহাশয়, আপনাকে একটি কথা বলি—আপনি এ বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া ভালো করেন নাই।

—কেন?

—এ বাড়ীর সবাই ফাঁস্থড়ে আর শুধু এ বাড়ী কেন, এ গ্রামের সবাই ফাঁস্থড়ে—এ রকম গ্রাম অনেক—পথের দু'পাশের অনেক গ্রামই ফাঁস্থড়েদের।

বধূর কথা শুনিয়া বৃদ্ধের দেহ কাঁপিতে লাগিল, মুখ শুকাইয়া আসিল, উনুনের উপর হইতে তিনি কড়াই নামাইয়া রাখিলেন।

বধূ বলিল—আপনি যদি নিজের ও পুত্রের মঙ্গল চান, তবে কিছুমাত্র ভাববৈকল্য দেখাইবেন না, রাঁধিতেছেন রাঁধুন, আর আমি যাহা বলি মন দিয়া শুনুন।

—তাই বলো মা, বলিয়া বৃদ্ধ কড়াই আবার উনুনে চড়াইলেন।

বধূটি বলিতে লাগিল—এ বাড়ীর কর্ত্তার সাত ছেলে, কনিষ্ঠ আমার স্বামী। তিনি এসব পছন্দ করেন না, কিন্তু হইলে কি হয়, কর্ত্তা ও অন্যান্য পুত্রদের ইহাই ব্যবসা। এখন পুত্ররা গ্রামান্তরে গিয়াছে—সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিবে—এবং রাত্রে আপনাদের নিকেশ করিবে। এখন আপনাদের বাঁচিবার একমাত্র উপায় আমার পরামর্শ অনুসারে চলা।

বৃদ্ধ বলিলেন—মা, তুমি আমার পূর্ব্বজন্মের মা, বলো মা, কি করিতে হইবে।

—আমি বলি, আপনি রাঁধিতে রাঁধিতে শুনিয়া যান। যাহা বলি সব মনে রাখিবেন, তাহার যথাযথ বর্ণনাতেই

আপনাদের বাঁচিবার পন্থা। আর আপনার পুত্রকেও সব শিখাইয়া দিবেন। এই বলিয়া বধূটি ব্রাহ্মণকে আনুপূর্ব্বিক সব শিখাইয়া পড়াইয়া দিল।

পিতা ও পুত্র আহারাদি সারিয়া যখন বিশ্রাম করিতেছেন তখন গৃহকর্ত্তা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল—কি ঠাকুরমশাই সেবা হইল ?

রামলোচনের পিতা বলিল—আজ্ঞে হাঁ, খুব পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

রায় মহাশয় বলিল—সে আপনাদের গুণে—গরীবের ঘরে সামান্য আয়োজন।

—বলেন কি ! রাজার ঘরেও আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দেখিয়াছি আয়োজন এর চেয়ে বেশি নয়, তাছাড়া এমন আন্তরিকতা সেখানে দুর্লভ।

এইভাবে কিছুক্ষণ উভয়পক্ষে আপ্যায়ন সমাধা হইলে রামলোচনের পিতা বলিলেন—হাঁ মশাই, এ গ্রামে টুনি নামে একটি মেয়ের বিয়ে হইয়াছে। কোন্ বাড়ীতে বলিতে পারেন ? (এ সবই কনিষ্ঠা বধূর শিক্ষামত কথিত)।

রায় মহাশয় বলিল—টুনি বলিলে কি বুঝিতে পারা যায় ? পিতার নাম কি ? আপনি জানিলেন কি ভাবে ?

—আরে আমি জানিব না ? আমি যে তাদের গুরুবংশ ! তা বটে মেয়েটির ডাক-নাম শুনিয়া কিভাবে বুঝিবেন ! তার পিতার নাম শ্রীরামজয় বাঁড়ুজ্জে !

—বলেন কি ?

—স্বরূপ বলিতেছি। আমি পর্য্যটনে বাহির হইয়া বাঁড়ুজ্জের বাড়ীতে উপস্থিত হই। বিদায়ের সময়ে বাঁড়ুজ্জে বলিল—গুরুঠাকুর, যদি অমুক গ্রামে যান তবে একবার টুনির সন্ধান লইবেন। বাঁড়ুজ্জে অবশ্য টুনির শ্বশুরের নামটাও বলিয়াছিলেন, বুড়া মানুষ সব ভুলিয়া বসিয়া আছি।

এবারে চিন্তিত রায় মহাশয় বলিল—সে কি! রামজয় বাঁড়ুজ্জে যে আমার বেয়াই। টুনি যে আমার কনিষ্ঠা বধূ!

—তাই নাকি ? যিনি আমাদের রান্নার যোগাড় দিতেছিলেন ? একদম চিনিতে পারি নাই। সেই কবে নেহাৎ বালিকা বয়সে দেখিয়াছি। কি আশ্চর্য্য!

তখন রায় মহাশয় ডাকিল—ছোট বৌমা দেখিয়া যাও, কে আসিয়াছেন। তোমার পিতার গুরুদেব!

ছোট বউ ডাক শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। (সবই সেই পূর্ব্ব শিক্ষামত)।

রায় বলিল—প্রণাম করো, প্রণাম করো! চক্রবর্ত্তী মহাশয় তোমাদের গুরুদেব।

ছোট বউ প্রণাম করিল।

চক্রবর্ত্তী বলিল—আহা হা বেঁচে থাকো মা, বেঁচে থাকো!

তারপরে বলিল—কি টুনু, চিনিতে পারিলে ? তা আর পারিবে কিভাবে ? তখন পাঁচ বছরেরটি ছিলে! তখনকার কথা কি আর মনে থাকে ?

ছোট বধূ তখন পিতার, মাতার, ভাই বোন, ঝি চাকর, বাড়ীর গোরু, ছাগল মায় গাছপালার সংবাদ শুধাইতে লাগিল আর চক্রবর্ত্তী পূর্ব্বশিক্ষা-মতো সব উত্তর দিতে লাগিল। তাহাদের আলাপে রায় মহাশয়ের সন্দেহের কোন কারণ ঘটিল না।

তখন রায় মহাশয় ভিতরে গিয়া অন্য পুত্রদের বলিল—এখনি কি সর্ব্বনাশ হইত! শিকার যে ছোট বউমার পিতৃ-কুলের গুরু!

শিকার হস্তচ্যুত হওয়ায় পুত্ররা দুঃখিত হইল। রায় মহাশয় কনিষ্ঠ পুত্রকে ডাকে নাই—এ সব ব্যাপারে তাহার অনিচ্ছা, তাহাকে রায় মহাশয় কুলাঙ্গার বলিয়া সম্বোধন করিত।

চক্রবর্ত্তী পিতা-পুত্র এ যাত্রা প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন—শুধু তাই নয়, পরিবারের সকলের আদর-আপ্যায়নে অস্থির হইয়া উঠিলেন। সে রাত্রি তাঁহারা রায় মহাশয়ের গৃহে থাকিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে ছোট বধূর শ্বশুরকুলের প্রণামী গ্রহণ করিয়া স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রায় মহাশয় ইসারায় বলিয়া দিল—চক্রবর্ত্তী মশায়, পথটা খারাপ, অমুক গ্রামে কখনো আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না।

এ সব কথা রায় মহাশয়ের জানিবার বিষয় বটে!

বিদায়ের পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী ছোট বধূকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—বেঁচে থাক মা, স্বামী-পুত্রে চিরায়ুষ্মতী হও।

(এবারে কেবল পূর্ব্বশিক্ষা মতো মাত্র নয়, সত্য সত্যই আন্তরিক)।

তখন পিতা-পুত্রে দ্রুত হাঁটিতে শুরু করিলেন।

পিতা ভাবিতেছিলেন—নারায়ণ, নারায়ণ, এখন ভালোয় ভালোয় গৃহে ফিরিতে পারিলে হয়! এ পথে আর নয়।

পুত্রও চিন্তা করিতেছিলেন, কিন্তু সূত্র ভিন্ন।

তিনি ভাবিতেছিলেন, এই তো পথ—অন্য পথ নাই। শাস্ত্রের একটি সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকাংশ তাঁহার মনে পড়িল, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" সত্যই তো আর কোন্ পথ আছে? তখনি আবার মনে পড়ল, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" বাস্তবিক রায় মহাশয় ও তাহার পুত্রগণ সকলেই সবল। আর তা হইবেই না বা কেন, এ সব কাজ তো দুর্ব্বলের নয়। নিজের সবল মাংসপেশীপুষ্ট বাহুদ্বয়ের দিকে তাকাইয়া রামলোচন ভাবিলেন, রায় মহাশয়ের পুত্রগণ পারিলে আমিই বা না পারিব কেন? বিশেষ আমি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ; আমি শাস্ত্রের কৃপায় জানিতে পারিয়াছি যে কাজটা খারাপ নয় —সংসারই যখন মিথ্যা, তখন কাজের ভালো মন্দ আর ওঠে কই? তিনি ভাবিলেন, রায় মহাশয়ের পুত্রগণ নিশ্চয়ই শাস্ত্রজ্ঞ নয়, কাজেই তাহারা ব্যাপারটাকে দুষ্কর্ম্ম মনে করে, মনে করিয়া অশান্তি ভোগ করে, অশান্তি হইতে তাহাদের আয়ু ও মানসিক শান্তি হানি হয়। আমার ক্ষেত্রে সেসব বালাই নাই। বরঞ্চ বিপরীতটা হইবারই সম্ভাবনা। এইরূপ

নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে রামলোচন পিতার পিছে পিছে চলিতেছেন।

গৃহে পৌঁছিবার পরে রামলোচনের আর সন্দেহ রহিল না যে রায় মহাশয়ের পথই পথ। কিন্তু সংসারের ট্রাজেডি এই যে, পথটা জানিতে পারিলেই যে তাহা অচিরে গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তাহা নয়। যুক্তি ও সংস্কারের মধ্যে অনেক সময়ে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

শীতকালে পুকুর ঘাটে স্নান করিতে গিয়া হঠাৎ গামছাখানা জলে পড়িয়া গেলে, গামছা ডুবিয়া যাইতেছে দেখিয়াও হিম শীতল জলে নামিতে দ্বিধাবোধ হয়—কিন্তু এমন সময়ে পিছন হইতে অপর কোন স্নানার্থী ঠেলিয়া দিলে জলে নামিতে হয়—তখন গামছাখানি উদ্ধার পায়।

এক্ষেত্রে রামলোচনকে তেমনি ঘটনাচক্র ধাক্কা মারিল। যে পথ জানা সত্ত্বেও তিনি গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ বোধ করিতেছিলেন, উক্ত ধাক্কার ফলে সেই পথেই আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু তার আগে তাঁহার জীবনে আর একটি ঘটনা ঘটিল। তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হইল। সর্ব্ববন্ধনমুক্ত রামলোচনের ইহাতে দুঃখ হইবার কথা নয়—কিন্তু তবু দুঃখ হইল। তাহাতে বুঝিতে পারা যায় তাঁহার মধ্যে কোথাও একটু-খানি কাঁচা ছিল—নহিলে এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিবে কেন?

পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপ্ত হইলে রামলোচন ভাবিতেছিলেন—এখন তিনি কি করিবেন? আবার কি কাশীতে ফিরিয়া গিয়া কুন্দনলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন, না, তাঁহার মানসগুরু মংরুর সন্ধানে বাহির হইবেন? এমন সময়ে হরিচরণ নামে একজন প্রতিবেশী আসিয়া বলিল—রাম, আমরা শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছি, তুমিও চলো না।

প্রস্তাবটি রামের ভালো লাগিল। তিনি রাজী হইলেন।

হরিচরণ বলিল—পথ বিঘ্নসঙ্কুল, সর্ব্বত্র ঠগ, ফাঁসুড়ে ও ঠ্যাঙাড়ের ভয়। কাজেই অনেক লোক একত্র যাওয়াই বিধেয়।

সে আরও জানাইল যে তাহাদের 'সেথো'রা আগামী কল্য প্রাতে নিকটবর্ত্তী কৈবর্ত্তগ্রামে সমবেত হইবে, সেখানে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে হইবে।

পরদিন যথাসময়ে কৈবর্ত্তগ্রামে উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখিতে পাইল যে যুবক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকে প্রায় জন পঞ্চাশেক লোক হাটতলায় তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের দলপতি ভবতারণ চাটুজ্জে। চাটুজ্জে মশাই অনেকবার শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছেন কাজেই পথঘাট তাঁহার নখদর্পণে। তিনি হরিচরণ ও রামলোচনকে দেখিয়া খুশী হইলেন। তখন সকলে 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কয়েক ক্রোশ পথ চলিয়া সন্ধ্যাবেলা তাহারা তুলসীবাড়ী চটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পরদিন আহারাদি সারিয়া আবার তাহারা যাত্রা করিল এবং আবার কয়েক ক্রোশ পথ চলিয়া সন্ধ্যাবেলা হলুদকুঠী চটিতে আসিয়া পৌঁছিল।

পরদিন যখন তাহারা যাত্রা করিতে উদ্যত এমন সময়ে জনপঞ্চাশেক লোকের আর একটি তীর্থযাত্রিদল সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। নূতন দলের কর্ত্তা চাটুজ্জে মশাইকে বলিল—আপনারা কি শ্রীক্ষেত্রে চলিয়াছেন?

—সেইরূপই ত অভিপ্রায়! আপনারা?

—পাপমুখে কেমন করিয়া বলি যে শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছি। তবে জগন্নাথ যদি দয়া করেন, তবে শেষ পর্য্যন্ত শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছিবার আশা রাখি।

চাটুজ্জে মশাই নূতন দলের নায়ক শিরোমণি মশায়ের ভক্তিতে বিগলিত হইয়া বলিল—তবে চলুন না কেন একযোগে যাওয়া যাক্। পথঘাটের বিপদের কথা তো জানেন।

শিরোমণি মশাই বলিল—এর চেয়ে আনন্দের আর কি হইতে পারে? কারণ "তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

শিরোমণির মুখে সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়া চাটুজ্জের প্রীতি ভক্তির স্তরে গিয়া পৌঁছিল। তখন দুই দল একযোগে যাত্রা করিল।

সেদিন সন্ধ্যায় একটি চটিতে পৌঁছিয়া সকলে রাত্রি যাপন করিল। পরদিন প্রাতে চাটুজ্জে মশাই একাকী চটির সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামটিতে প্রবেশ করিল। প্রকাশ্য ইচ্ছা গ্রামটি

পরিদর্শন, আসল ইচ্ছা আফিঙের অনুপান কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সংগ্রহ। চাটুজ্জে এক গোয়ালার বাড়ীতে আসিয়া দেখা দিল। বুড়ো গোয়ালা ব্রাহ্মণকে খুব সমাদর করিয়া বসাইয়া দুগ্ধ দধি ছানা প্রভৃতি সেবার জন্য দিল। চাটুজ্জে দুগ্ধ ও দধি আত্মসাৎ করিয়া ছানাটুকু চাদরে বাঁধিয়া লইল।

তখন গোয়ালা শুধাইল—আপনারা বুঝি শ্রীক্ষেত্রে চলিয়াছেন?

—কি করিয়া জানিলে বাপু!

—শ্রীক্ষেত্রের পথের ধারেই আমাদের গ্রাম, যাত্রী চলাচল আমরা বুঝি। তাছাড়া ভোর বেলা একবার চটির দিকে গিয়াছিলাম কিনা!

—ঠিকই বুঝিয়াছ বাপু, আমরা শ্রীক্ষেত্রেই চলিয়াছি।

এবারে গোয়ালা কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল—ঠাকুর মশাই আপনি ব্রাহ্মণ, বর্ণশ্রেষ্ঠ, তাছাড়া আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিলেন, আপনাকে একটা কথা বলি।

চাটুজ্জে কৌতূহল বোধ করিয়া বলিল—কি কথা বাপু?

—আপনারা ফাঁস্থড়ের হাতে পড়িয়াছেন।

—ফাঁস্থড়ের হাতে?

চক্রবর্ত্তীর মুখে আর কথা সরিল না।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ফাঁস্থড়ের হাতে।

—বুঝিলে কি ভাবে?

—ওখানে দেখিলাম কিনা! ওদের অনেককে চিনি।

তারপরে বলিল—আচ্ছা বলুন তো মাঝপথে আর একটা দল কি আপনাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে ?

—দিয়াছে বই কি ?

—তারা সংখ্যায় কত ?

—জন পঞ্চাশ।

—আপনারা ক'জন ছিলেন ?

—জন পঞ্চাশ হবে।

—তবে আর সন্দেহ নাই যে আপনারা ফাঁস্থড়ের হাতে পড়িয়াছেন।

চাটুজ্জে বিচলিত হইয়া বলিল—এখন উপায় ?

গোয়ালা বলিল—ঘুণাক্ষরেও যদি ভয়ের কথা প্রকাশ করেন, তবে রক্ষা নাই। বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া চলিলে এখনো উদ্ধার পাইতে পারেন।

চাটুজ্জে বলিল—তাই চলিব বাপু, এখন যা হয় একটা উপায় বলিয়া দাও, তুমি আমার পুত্রতুল্য। বিপদে চাটুজ্জের সত্যই মতিভ্রম ঘটিয়াছে নতুবা গোয়ালাকে পুত্রতুল্য বলিত না, কারণ দু'জনেরই বয়স প্রায় সমান, ষাটের কোঠায়। এমনস্থলে একজনের পক্ষে অপরের পুত্র হওয়া সম্ভব নয়।

চাটুজ্জের বিঘ্নিতবুদ্ধি হইবার আরও একটি প্রমাণ এই যে, এত কথা গোয়ালা কেমন করিয়া জানিল চাটুজ্জে জিজ্ঞাসা করিল না। খুব সম্ভব জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর পাইত না। প্রকৃত তত্ত্ব এই—গোয়ালা নিজেও ফাঁস্থড়ে

দলভুক্ত ; এক দলের নয়, অন্য দলের। এমন শত শত দল তখনকার দিনে ছিল। শ্রীক্ষেত্র ও গয়া কাশী যাইবার পথের পাশে ঠগ, ঠ্যাঙাড়ে, ফাঁস্থড়ের গ্রামের সীমাসংখ্যা ছিল না। এমন অনেক গ্রাম ছিল যাহার প্রত্যেকটি অধিবাসীই ঠগ। "ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়" প্রবাদটি সেই ভয়াবহ স্মৃতি বহন করিতেছে।

গোয়ালা নিজেও সুযোগ পাইলে পথিক হত্যা করিয়া থাকে। সকল পথিকের মধ্যে শিকার হিসাবে তীর্থযাত্রীই নাকি শ্রেষ্ঠ। তৎসত্ত্বেও চাটুজ্জের কাছে সমব্যবসায়ীদের রহস্য কেন যে সে প্রকাশ করিয়া দিল তাহা বলিতে পারি না। জিজ্ঞাসা করিলে সে নিজেও বলিতে পারিত না। অতি পাষণ্ডের হৃদয়েও কোথায় কেমন করিয়া কেন যে একটুখানি কোমলতা থাকিয়া যায় এ বড় বিস্ময়।

গোয়ালা বলিতে শুরু করিল—এরা যদি ঠগ ঠ্যাঙাড়ে হয়, তবে ভয় তত নয়, কারণ তারা লাঠি দিয়া মারে, বিপদের সময় বুঝিতে পারা যায়, কাজেই বাঁচিবার আশাও থাকে। কিন্তু আমার যতদূর বোধ এরা ফাঁস্থড়ে।

—সর্ব্বনাশ !

—এরা মারে গলায় ফাঁস দিয়া, কোনমতে টুঁ শব্দটি হয় না, আর এক লহমার মধ্যেই কর্ম্ম ফরসা।

—তবে এখন করি কি ?

—আর যাই করুন মুখে কিছু প্রকাশ করিবেন না। আরও শুনুন, সব কথা মনে রাখিতে চেষ্টা করিবেন, ভুলিবেন না—

এই বলিয়া বৃদ্ধ গোয়ালা আবার আরম্ভ করিল ;—

—আজ বিকাল বেলায় বামুনদাঁড়া নামে এক চটি পাইবেন। তার কাছেই গ্রাম। সেখানে থাকিতে চেষ্টা করিবেন, বলিবেন যে আর এগোতে পারি না। শিরোমণি মশাই বলিবেন যে এখনো বেলা আছে, চলুন এগোনো যাক। কিন্তু মশাই তার পরামর্শ শুনিয়াছেন কি মারা পড়িয়াছেন। তার পরের চটি পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইবে—আর তার কাছে কোন লোকালয় নাই, চার দিকে মস্ত মাঠ, সেখানে কত যাত্রী যে মারা পড়িয়াছে! আপনাদেরও সেখানে মারিবে। তাই বলি তার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বামুনদাঁড়াতে থাকিবেন।

চাটুজ্জে মশাই শুধাইলেন—ফাঁসুড়েরা মারে কি উপায়ে ?

—তা জানেন না! ওদের অস্ত্র ছোট এক টুক্‌রা গামছার মতো কাপড়। তার এক কোণে ভারী সীসার একটি গোলক বাঁধা। গামছা টুকরা কখন যে গলায় জড়াইয়া দেয়—আর নিমেষের মধ্যে দম বন্ধ হইয়া শিকার মারা পড়ে।

চাটুজ্জে শুধাইল—তুমি এত কথা জানিলে কি ভাবে ?

উত্তরে বৃদ্ধ গোয়ালা একবার হাসিল, বলিল—ওসব কথা এ অঞ্চলের সবাই জানে।

আসল কথা প্রকাশ করিলে চাটুজ্জে জানিতে পারিত যে গোয়ালাও এভাবে কতজনকে মারিয়াছে। তবে যে সে আজ চাটুজ্জেকে মুক্তির উপায় বলিয়া দিল সে কেবল নিয়তির ইঙ্গিত।

চাটুজ্জে তাহার কাছে বিদায় লইয়া স্বদলে আসিয়া যোগ দিল এবং আহারান্তে দুটি দলই একত্র যাত্রা করিল।

বিকাল বেলায় তাহারা বামুনদাঁড়া চটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

চাটুজ্জে প্রস্তাব করিল--আজ এখানেই থাকা যাক।

শিরোমণি বলিল—সে কি মশাই, এখনো এক প্রহর বেলা আছে! এখনি কি, এগোনো যাক।

চাটুজ্জে বলিল—বড় ক্লান্ত।

শিরোমণি বলিল—না, না, চলুন, এর পরের চটি জায়গা ভালো, সব রকম জিনিস পাওয়া যায়—আমি সব জানি কি না!

চাটুজ্জের নিজের দলও বামুনদাঁড়ায় থাকিতে রাজি নয়।

চাটুজ্জের ভুল হইয়াছিল এই যে, দলের কাউকে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে নাই, বলিতে পারে না, তাহাতে চার কান হইবার আশঙ্কা। অতএব বাধ্য হইয়া শিরোমণির প্ররোচনায়. নিজের দলের চাপে তাহাকে অগ্রসর হইতে হইল। সে দুর্গা নাম জপিতে জপিতে চলিল—ভাবিল—ঠাকুর যা করেন।

এদিকে চাটুজ্জে মশাই ভগবান্‌কে স্মরণ করিতেছে; ওদিকে তার পাশে পাশে চলিয়াছে শিরোমণি মশাই, সে-ও মনে মনে ভগবান্‌কে সমান আগ্রহে স্মরণ করিতেছে; ভাবিতেছে, ভগবান্! শিকার যেন ফস্কাইয়া না যায়; ভাবিতেছে, শিকার বেশ শাঁসালো বলিয়াই মনে হইতেছে, কিন্তু বামুনদাঁড়ায় রাত্রি যাপনের ইচ্ছায় কেমন যেন সন্দেহ হইতেছে; তবে কি আমাদের স্বরূপ টের পাইল? প্রভু, তা তো হইবার কথা নয়, আমাদের সকলেরই গলায় কণ্ঠি, কপালে হরিনামের ছাপ, চেষ্টার তো আমরা ত্রুটি করি নাই; এখন তুমি প্রসন্ন থাকিলেই আর ভয় নাই।

সামান্য একটুখানি অবধান করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে চাটুজ্জে ও শিরোমণির ভগবৎ-চিন্তা পাশাপাশি সমান্তরাল স্রোতে অব্যাহত গতিতে ধাবমান—এবং সমান্তরাল প্রবাহ যে অনন্তে গিয়া মিলিত হয় সেই এক ও অদ্বিতীয় ভগবান্‌ই বোধ করি ভিন্নপ্রকৃতি ও ভিন্ন-উদ্দেশ্য চাটুজ্জে ও শিরোমণি উভয়েরই লক্ষ্য। এ হেন প্রার্থীদ্বয়ের স্বতোবিরুদ্ধ মনোবাঞ্ছা ভগবান্ কিরূপে যুগপৎ পূরণ করিয়া থাকেন সে আধ্যাত্মিক রহস্যভেদে একমাত্র ঋষিরাই সক্ষম! উহা সাধারণের অগম্য।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার এবং পরবর্ত্তী চটি আসিয়া পড়িল। চন্দ্রহীন অন্ধকার যেমন নিবিড়, জনপদহীন চটি তেমনি নিস্তব্ধ। আর সম্প্রতি চাটুজ্জে জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছে,

চটির মালিকদের গতিবিধি এবং কথাবার্ত্তাও তাহার কেমন যেন সন্দেহাত্মক মনে হইতে লাগিল।

শিরোমণি বলিল—চাটুজ্জে মশাই ঐ বামুনদাঁড়ায় রাত্রি-যাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। আরে ছিঃ! দেখুন তো কেমন মনোরম স্থান!

পাছে উত্তরে শিরোমণির সন্দেহ উদিত হয় তাই চাটুজ্জে বলিল—নাঃ, জায়গাটি সত্যই মনোরম।

—আর অন্ধকারটি?

—নববধূর চোখের কাজলের মতো স্নিগ্ধ।

শিরোমণি হাসিয়া উঠিয়া বলিল—চাটুজ্জে মশাই যে কবি!

—সে কথা নেহাৎ মিথ্যা নয়, কিছু কিছু লিখি।

—বটে? কি রকম?

—রকম সামান্তই, দু' চারটে পদ।

—শুনিতে পাই না?

—বিলক্ষণ!

চাটুজ্জে ইহাই চাহিতেছিলেন, ঘটনাচক্রে কথাবার্ত্তার মোড় সেইদিকে ফেরাতে তাহার সুবিধা হইয়া গেল। এই সুবিধা আকস্মিক ব্যাপার মাত্র নয়, ভক্তরা সাক্ষ্য দিবে ইহা ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ—এবং ইহারই অভিমুখে জগৎ-প্রবাহ লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া চলিতেছিল।

সকলের আহারাদি শেষ হইলে চাটুজ্জে বলিল—এখন কীর্ত্তন গান হইবে।

শ্রীক্ষেত্রের যাত্রী কীর্ত্তনে আপত্তি করিতে পারে না, এমন কি গভীর রাত্রে ক্লান্ত শরীরে ঘুম পাইলেও আপত্তি করিতে পারে না।

চাটুজ্জের রচিত ২।৪ টি পদ দলের লোকের পরিচিত। সকলেই তো গাঁয়ের লোক, কাজেই চাটুজ্জে যখন গান ধরিল, দোহারের অভাব ঘটিল না।

গায়কের দল যতই তন্ময় হইয়া কীর্ত্তনের স্রোতে ডুবিতেছিল, শিরোমণির দল, ততই অধিকতর আগ্রহে, গায়কদের পিছনে কাছে ঘেঁষিয়া বসিতেছিল, আর অন্ধকারে ট্যাঁকে হাত দিয়া দেখিতেছিল যে সীসার গোলকটি যথাস্থানে আছে কি না। আর তারপরে সীসার গোলকটি বাহির করিয়া স্কন্ধস্থিত গামছাখণ্ডের এক কোণে তাহা সযত্নে বাঁধিয়া লইতেছিল ; এই শ্রেণীর কাজে তাহারা এমনি অভ্যস্ত যে এ জন্য শিরোমণির ইঙ্গিতের প্রয়োজন ছিল না ; অবস্থা বুঝিয়া তাহারা ব্যবস্থা করিতে শিখিয়াছে। আর দলের লোক যখন এইরূপে কীর্ত্তন শুনিতেছিল তখন স্বয়ং শিরোমণি স্বয়ং চাটুজ্জের পিছনে বসিয়া পরম ভক্তিভরে চরম লগ্নের অপেক্ষা করিতেছিল ; শিরোমণি শিকারের গলায় ফাঁস দিবামাত্র আর সকলে স্ব স্ব শিকারের উপরে গিয়া পড়িবে।

এমন সময়ে অপ্রত্যাশিত এক কাণ্ড ঘটিল। সহসা চাটুজ্জে দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য সুরু করিল, আর অমনি তাহার দলের লোকজনেও উঠিয়া নাচিতে

লাগিল। শিরোমণি ও তাহার দল প্রমাদ গণিল। এরূপ বর্ত্তমান লোকের গলায় ফাঁস দিয়া মারা সম্ভব নয়—ঠ্যাঙাড়েরা ওসব করিতে পারে। যে-শিল্পের যে পন্থা!

শিরোমণি ভাবিল—এ কি আপদ! ভাবিল, এক সময়ে থামিতেই হইবে। তখন দেখা যাইবে।

কিন্তু এ যে থামার লক্ষণ নাই, সারা রাত্রি চালাইবে নাকি?

—চাটুজ্জে মশাই, এবার বিশ্রাম করুন, রাত্রি তৃতীয় প্রহর আগত।

উত্তরে চাটুজ্জে পদের একটি নূতন কলি গাহিল—

রজনী আঁধারা এ কালো ভোমরা বসেছে মজেছে ফুলে।

আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে শিরোমণি বলিল—চাটুজ্জে মশাই, এবারে ক্ষান্ত হোন, অসুখ বিসুখ করিতে পারে।

চাটুজ্জে গাহিল—

এ রজনী সখী দুখে যদি জাগি
ফিরিয়া পাইব প্রাণ
গোপিকারমণ কান!

শিরোমণি ভাবিল—নাঃ, সব ফস্‌কাইয়া গেল!

শিরোমণির কথাই সত্য হইল, সারা রাত্রির মধ্যে কীর্ত্তন ও নাচ থামিল না, কাজেই শিরোমণির সুবর্ণ-সুযোগ সত্য সত্যই ফস্কাইয়া গেল।

এই ঘটনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে ভগবান্ দয়া ও ন্যায়ের পক্ষে, নতুবা চাটুজ্জেরাই বা বাঁচিবে কেন,

আর শিরোমণিরাই বা ব্যর্থকাম হইবে কেন! ভগবৎ-বিধানে বামপন্থীদের এই যে অভিযোগ, যেহেতু ভগবান পাপী ও পুণ্যবানের প্রার্থনা সমান আগ্রহে পূরণ করিয়া থাকেন, সেই জন্য তিনি বিশ্বব্যাপার নিয়ন্ত্রণে অক্ষম ও দায়িত্বহীন, এই অভিযোগও অপ্রমাণ হইয়া যায়।

দুরাত্মা শিরোমণি ভগবানের হস্তক্ষেপে হারিল, আর পুণ্যাত্মা চাটুজ্জের হইল জয়।

পরদিন প্রাতঃকালে চাটুজ্জের দল বিশ্রাম না করিয়াই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল।

শিরোমণি বলিল—একি, আজকার দিনটা বিশ্রাম করুন, সারারাত্রি তো জাগরণ গেলো।

চাটুজ্জে বলিল—তীর্থযাত্রী তো স্বপ্নে জাগরণে ভগবানের নাম করে—তার জন্য আবার বিশ্রাম কেন?

শিরোমণি বলিল—তবে আপনারা এগোন, আমরা আজকার দিনটা এখানেই থাকিব।

—যেমন আপনাদের অভিরুচি, বলিয়া চাটুজ্জে যাত্রার নির্দ্দেশ দিল।

শিরোমণির সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চাটুজ্জের দুঃখের কারণ ছিল না। আর চাটুজ্জেকে ছাড়িয়া দিতে শিরোমণির যথেষ্ট দুঃখের কারণ থাকিলেও আর বাধা দিবার হেতু ছিল না, কেননা চাটুজ্জে ইতিমধ্যে শিরোমণির স্বরূপ বুঝিয়া ফেলিয়াছে।

যে শিকার শিকারীর অভিসন্ধি বুঝিয়াছে তাহার পশ্চাদনুসরণ পণ্ডশ্রমমাত্র।

যথাসময়ে চাটুজ্জের দল যাত্রা করিল—শিরোমণির দল চটিতেই রহিয়া গেল।

রামলোচন শেষ রাত্রে ক্লান্ত হইয়া একটা ঘরের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি গেলেন না রহিলেন তাঁহার দলের কেহ সন্ধান করিল না। তীর্থযাত্রীদের দৃষ্টি দেবতাদের দিকেই এমন অভিনিবিষ্ট যে মানুষের দিকে তাকাইবার সুযোগ প্রায়ই তাহাদের ঘটিয়া ওঠে না। ফলে রামলোচনের যখন নিদ্রা ভাঙিল তখন বেলা মধ্যাহ্নের কাছাকাছি। তিনি দেখিলেন শুধু রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি নয় শরীর জ্বরে এমন অশক্ত যে মাথা তুলিবার উপায় পর্য্যন্ত নাই। তিনি আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যায় তাঁহার ঘুম ভাঙিল। তিনি ভাবিলেন এখন কি করিবেন? স্থান বিদেশ, সঙ্গীরা অপসৃত, কাছে যাহারা আছে অপরিচিত। তখন তাঁহার একবার বাড়ীর কথা, বহুদিনমৃত জননীর এবং সদ্যমৃত পিতার স্মৃতি মনে পড়িল, চোখে দু'চার ফোঁটা জলও দেখা দিল। ইহাতে সেই পুরাতন সত্যই বুঝিতে পারা যায় যে মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়—মোহমুদ্গর যতই গুরুতর হোক না কেন, ভিতরে একটু মোহ থাকিয়া যাইবেই।

শিরোমণি মহাশয় চটি পরিত্যাগের পূর্ব্বে ঘরে ঢুকিতেই শয্যাগত রামলোচনকে দেখিতে পাইল। এ কয়দিনে রামলোচনের সঙ্গে তাহার বেশ আলাপ পরিচয় হইয়াছিল।

বিস্মিত শিরোমণি শুধাইল—কি মশায়, আপনি যান নাই?

রামলোচন বলিলেন—আমার যাইবার উপায় ছিল না, শরীর জ্বরে বিশেষ অপটু।

—বলেন কি? তাই তো, গা যে আগুন। এখন?

—এখন এখানেই থাকা ছাড়া তো উপায় দেখি না।

—সে কি হয়! ব্যাধি না ব্যাধ! সতর্ক না হইলে বিপদ হইতে কতক্ষণ। চলুন, আমার সঙ্গে আমার গৃহে চলুন।

—আমার চলিবার শক্তি নেই।

তখন শিরোমণি সন্ধান করিয়া ডুলি সংগ্রহ করিল, এবং রামলোচনকে তুলিয়া লইয়া শেষ রাত্রি তক্ স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল।

ফাঁসুড়ে শিরোমণির এই সদয় ব্যবহারে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কেননা কোন মানুষই সম্পূর্ণ নিষ্ঠুর বা দয়াবতার নয়—নানারূপ বিচিত্র উপাদানে, অনেক সময়ে বিরুদ্ধ উপাদানে মানুষ তৈরী। গৃহী যদি নিষ্ঠুর হয়, ফাঁসুড়ে তবে সময়-বিশেষে সদয় না হইবে কেন? ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যদি আধখানা মিথ্যা কথা বলিতে পারে দাগাবাজের পক্ষে একখানা সত্য কথা বলা কি এতেই অসম্ভব! যাই হোক, মোটকথা এই যে ঘটনাচক্রে দলপরিত্যক্ত রামলোচন ফাঁসুড়ে শিরোমণির

গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে রামলোচন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে "যাদৃশী ভাবনা যস্য" শাস্ত্র-বাক্যটি মিথ্যা নয়, নতুবা শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিয়া তিনি দিগ্বিজয়ী ফাঁসুড়ের আবাসে উপনীত হইবেন কেন? ভগবান্ তাঁহার মনের গুপ্ত বাসনা জানিতে পারিয়াই তাঁহাকে অভীষ্ট ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন—তাছাড়া অন্যভাবে এই অবস্থান্তরের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়!

দীক্ষা

তারাচাঁদ শিরোমণি জোড়ামৌ গ্রামের অধিবাসী। তাহার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। জমি-জিরাৎ, ক্ষেতখামার ও লগ্নী কারবারে তাহার স্বচ্ছন্দে চলে; দোল দুর্গোৎসবও সে আড়ম্বরের সহিত করিয়া থাকে। শিরোমণি তাহার উপাধি। দশটা গাঁয়ের লোকে তাহাকে শিরোমণি ঠাকুর বা শিরোমণি মশায় বলিয়া জানে।

কিন্তু এখানেই তাহার পরিচয় সীমাবদ্ধ নহে। সে একজন উচ্চদরের ফাঁসুড়ে। দশখানা গ্রাম যদি তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া জানে, বিশখানা গ্রাম জানে ফাঁসুড়ে দলপতি বলিয়া, আর একশ খানা গ্রাম তাহার নামে কম্পমান হইয়া থাকে।

প্রথম যখন এই বৃত্তি সে অবলম্বন করে, প্রতিযোগীর অভাব ছিল না; কিন্তু এখন সে এ বিষয়ে নিঃসপত্ন। পূর্ব্বতন প্রতিযোগীরা হয় তাহার হাতে মারা পড়িয়াছে, নয় তাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া তাহার দলভুক্ত হইয়াছে। এখন তাহার এক ডাকে পাঁচহাজার লোক আসিয়া খাড়া হয়। কিন্তু সে রকম ডাক দিবার উপলক্ষ্য বড় হয় না। কেন তা খুলিয়া বলা আবশ্যক, কারণ কালক্রমে ফাঁসুড়ে-শিল্পের লোপ পাইয়াছে, লোকে বিশেষ খবর রাখে না।

ফাঁস্থড়ে ও ঠ্যাঙাড়ে দুই শ্রেণীর ব্যবসায়। আর দশটা ব্যবসায়ের মতো এ দুটাও ব্যবসায় ছাড়া আর কিছুই নয়, তাহার বেশীও নয়, কমও নয়। অন্য ব্যবসায়ে যেমন লজ্জা বা ভয়ের কারণ নাই, তেমনি ফাঁস্থড়েগিরি বা ঠ্যাঙাড়েপনাতেও লজ্জা বা ভয়ের কারণ ছিল না, অন্ততঃ তখনকার দিনে ছিল না।

কিন্তু এটুকু বলাতে কিছুই বলা হইল না। আরও বিশদ ব্যাখ্যা আবশ্যক।

ঠ্যাঙাড়েরা লাঠি দিয়া ঠ্যাঙাইয়া মারে, ফাঁস্থড়েরা মারে গলায় ফাঁস আঁটিয়া। ঠ্যাঙাড়ে বৃত্তি লাঠিসোটা এবং গায়ের জোরের উপর নির্ভর করে। পাকা লাঠি চাই, মজবুৎ হাত চাই, দলবলও ভারী চাই, তৎসত্ত্বেও হৈ হাঙ্গামা হয়, আক্রান্ত ব্যক্তি চীৎকার করিয়া লোক জমাইয়া ফেলিতে পারে, ফলাফল অনেক সময়েই অনিশ্চিত। মোটের উপরে ও একরকম গুণ্ডাবাজি, ভদ্র বা শিক্ষিত বা কৌশলীর যোগ্য ব্যবসায় নয়। তুলনায় দেখা যাইবে যে ফাঁস্থড়েগিরি অনেক উচ্চদরের শিল্প। ইহার উপকরণের মধ্যে হস্তপরিমিত এক খণ্ড বস্ত্র, এক কোণে লোহার একটি গোলক বাঁধা। উক্ত অস্ত্র (উহাকে অস্ত্র না বলাই উচিত) নীরব ক্ষিপ্রতায় আক্রান্তের গলদেশ বেষ্টন করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার শ্বাসবন্ধ করিয়া দেয়, ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণের স্থযোগও পাওয়া যায় না। ইহাই তো শিল্প। ইহাতে হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি

হৈ হাঙ্গামা কিছুই হয় না, জনবলও অনাবশ্যক। কাড়িয়া লওয়া এবং ঘুষ লওয়ার মধ্যে যে প্রভেদ—অনেকটা সেই প্রভেদ এই দুই শিল্পে।

এই জন্যই ফাঁসুড়ে ও ঠ্যাঙাড়ে পরস্পরকে ঘৃণা করে। ফাঁসুড়ে ভাবে ঠ্যাঙাড়ে চোয়াড়; ঠ্যাঙাড়ে ভাবে ফাঁসুড়ে শয়তান, কৌশলে কাজ সারে, গায়ের জোরের ধার ধারে না। এই জাতীয় প্রভেদ ও বিবাদ চোর এবং ডাকাতদের মধ্যেও আছে।

ডাকাতির মূলধন নিছক গায়ের জোর, তাহাতে কলা-কৌশল ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির স্থান নাই। এদিক হইতে বিচার করিলে চুরিকে উচ্চতর শিল্প বলিতেই হইবে। বস্তুতঃ ডাকাতি শিল্পই নয়, বড় জোর craft; আর চুরি সত্যকার art, অনেকের মতে একমাত্র art! চুরির আবার চূড়ান্ত পকেটমারা। এক পক্ষ কিছুই জানিতে পারে না, হঠাৎ ট্রামে উঠিয়া পয়সা বাহির করিতে গিয়া দেখে টাকার থলি নাই, কিম্বা সেই একেবারে বাড়ী গিয়া তবে শোকাবহ ঘটনাটি আবিষ্কার করে। শোক অবশ্যই অনিবার্য্য, কিন্তু কায়িক কষ্ট কিছুই হয় না; একি কম শিল্পসাধ্য ব্যাপার! কেমন সংযত, কেমন ভদ্র! যেমন ভদ্র ও সংযত বর্ত্তমান সমাজ, তাহারই যোগ্য বটে এই শিল্প! তুলনায় ডাকাতি নিতান্তই সেকেলে গুণ্ডাগিরি।

শিরোমণি মশাই ফাঁসুড়ে ছিল বলিয়া অমানুষ ছিল না। তাহার দান ধ্যান ক্রিয়া কর্ম্ম ও সংসার ছিল। সংসারে

ছিল তাহার একমাত্র সন্তান বিস্তি, বয়স দশ বারো হইবে, আর ছিল বিস্তির বৃদ্ধা পিসি। কয়েক বৎসর হইল বিস্তির মাতার মৃত্যু হইয়াছে। পত্নীবিয়োগের পর মনে বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় শিরোমণি মশাই ফাঁস্তুড়ে বৃত্তিতে অধিকতর মন দিয়াছে। বৈরাগ্যের ফলে অন্যান্য ব্যবসায়ে শিথিলতা ঘটে, এ ব্যবসায়ে ঘটে গভীরতর আসক্তি। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় অন্যান্য ব্যবসায়ের সঙ্গে এই ব্যবসায়ের মূলগত একটা পার্থক্য আছে। তা এমন থাকেই।

শিরোমণি পাল্কী হইতে নামাইয়া রামলোচনকে বহির্ব্বাটীর ঘরে শোয়াইয়া দিল, পথশ্রমে ও পীড়ায় রামলোচন তখন জ্ঞানশূন্যপ্রায়।

শিরোমণি বিস্তির পিসিকে ডাকিয়া বলিল—দিদি, বামুনের ছেলে, সেবা শুশ্রূষা করিও; মারা গেলে আমার ভিটেয় ব্রহ্মহত্যা হইবে।

ক্ষান্তমণি বলিল—সে কি কথা মাঠে ঘাটে যা হয় হয়, তা বলিয়া বামুনের ছেলে ভিটেয় মারা পড়িবে। এ কি একটা কথা!

ক্ষান্ত শুধাইল—কিন্তু পরিচয়টা কি? ভদ্রলোক বলিয়াই তো মনে হয়।

—ভদ্র ছাড়া কি অভদ্র লইয়া আমি কারবার করি! অন্য পরিচয় পরে হইবে, আগে আমি স্নান ও সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া লই।

এই বলিয়া শিরোমণি যথোদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল। ক্ষান্ত রুগীর ঘরে ঢুকিয়া রুগীর অবস্থা দেখিয়া ডাকিল—বিন্তি, একখানা হাতপাখা দিয়া যা মা!

সে রাত্রি ক্ষান্ত পিসি জাগিয়া বসিয়া রামলোচনকে পাখার হাওয়া করিল। ভোর বেলায় বিন্তির হাতে পাখা দিয়া ক্ষান্ত বাহিরে গেল। কিছুক্ষণ পরেই বিন্তি ছুটিয়া গিয়া জানাইল,—পিসি, শীগ্‌গির!

—কি হইল রে?

—হইবে আবার কি? ঠাকুর কি সব অং বং বকে।

—অং বং! চল তো দেখি।

ক্ষান্ত আসিয়া শুনিল সত্যই রামলোচন ঘুমের মধ্যে কি সব বকিয়া চলিয়াছে!

সে বলিল—এ যে শাস্তর মনে হইতেছে। যাই একবার তারাকে ডাকিয়া আনি।

ক্ষান্তর আহ্বানে তারাচাঁদ আসিল। তখনো রামলোচন বকিতেছিল।

তারাচাঁদ বলিল—এ যে গীতার বিশ্বরূপ দর্শন। লোকটা পণ্ডিত বটে!

বিন্তি বলিল—হইবে না কেন, পৈতা যা মোটা।

ক্ষান্ত বলিল—তুই থাম! তারপরে তারাচাঁদকে বলিল —দাদা, এ তুমি কাকে আনিলে?

—একটা অসুস্থ মানুষকে আনিয়াছি। তাছাড়া পণ্ডিত হইলেই বা ক্ষতি কি?

—সারিয়া উঠিলে ছাড়িয়া দিবে তো? না, তোমার দলে ভর্ত্তি করিবে?

ক্ষান্ত জানিত যে ফাঁসুড়েরা বলিষ্ঠ অপরিচিত ব্যক্তি আনিয়া দলবৃদ্ধি করে।

তারাচাঁদ বলিল—স্বেচ্ছায় দলে যদি থাকে ক্ষতি কি! তাছাড়া দলে দু'চারজন পণ্ডিত থাকা ভালো!

ক্ষান্ত অপ্রসন্ন মুখে বলিল—যেমন তোমাদের পাণ্ডিত্য, তেমনি তোমাদের ব্যবসা। দুয়েরই মুখে আগুন।

কয়েকদিনের মধ্যেই সকলের সেবাযত্নে এবং বৈদ্যের অভাবে রামলোচন সারিয়া উঠিল।

তখন তারাচাঁদ বলিল—ঠাকুর, এবারে অভিপ্রায় কি? শ্রীক্ষেত্র বলিয়া কি রওনা হইবেন?

রামলোচন বলিল—দল বল সব চলিয়া গিয়াছে, একা যাইব কি উপায়ে?

—তবে দেশে?

—সেখানেও যাওয়ার বড় ইচ্ছা নাই।

—সংসারে কে কে আছে, পিতা মাতা?

—কেউ নাই।

—বিবাহ?

—করি নাই।

—উত্তম। তবে যেখানে কাত সেখানেই রাত দেখিতেছি। এখানেই থাকিয়া যান! মশায় তো পণ্ডিত, আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, আমার চতুষ্পাঠীর ভার গ্রহণ করুন।

রামলোচন এই সমীচীন প্রস্তাবে রাজি হইয়া শিরোমণির গৃহে থাকিয়া গেলেন। ইহার কারণ নানাবিধ। দেশে ফিরিবার অনিচ্ছা, বিন্তির প্রতি একপ্রকার আকর্ষণ এবং ইসারায় ইঙ্গিতে শিরোমণির ব্যবসা সম্বন্ধে জ্ঞান।

শিরোমণির টোলে তিনি অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানে শিরোমণি স্বয়ং ও পড়ুয়াগণ চমৎকৃত হইল।

কিন্তু রামলোচনের মনে শান্তি ছিল না। টোলে শাস্ত্র পড়াইবার উদ্দেশ্যে দুর্লভ মানব জন্ম নিয়োগ করিবার জন্যই যদি তাঁহার জন্ম হয়, তবে কাশীতে গুরুর টোলে কি বাধা ছিল? স্বগৃহে পৈতৃক টোলে কি বাধা ছিল? তিনি নিশ্চয় জানিতেন তাঁহার জীবন মহত্তর লক্ষ্যে অভিনিবিষ্ট। তবে কিনা সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়।

সরাসরি শিরোমণির কাছে ফাঁসুড়েগিরি শিখিতে চাহিলে কি পরিণাম হইবে স্থির করিতে না পারিয়া সরলা বিন্তিকে গাছের কুল পাড়িয়া দিয়া ভুলাইয়া ফাঁস আঁটিবার কৌশল তিনি শিখিয়া লইলেন। ফাঁসুড়ে বাড়ীর ছেলে-মেয়েরাও মোটামুটি বিদ্যাটা জানে।

তারপরে অধীত বিদ্যার পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একদিন বিকালবেলায় তিনি একাকী মাঠের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন,

দেখিলেন, অদূরে একটা বাছুর চরিতেছে। রামলোচন ছুটিয়া গিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার গলায় ফাঁস আঁটিয়া দিলেন। বাছুরটা কয়েকবার ছট্‌ফট্‌ করিয়া সাধনোচিতধামে প্রস্থান করিল। নিজের সিদ্ধিতে আশাতীত হৃষ্টচিত্তে রামলোচন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু বিপদ দেখা দিল অপ্রত্যাশিত পথে। একজন লোক রামলোচনের কীর্ত্তি দেখিয়া ফেলিয়াছিল। গ্রামে আসিয়া সকলকে সে জানাইল। গোহত্যায় উত্তেজিত হইয়া গ্রামবাসী শিরোমণির গৃহে আসিয়া সব ঘটনা জানাইল। শিরোমণিকেও স্বীকার করিতে হইল কাজটা অত্যন্ত গর্হিত হইয়া গিয়াছে।

শিরোমণি এবং অভিযোগকারিগণ সকলেই ফাঁসুড়ে, কত নরনারী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, স্ত্রী, শিশু না তাহারা হত্যা করিয়াছে। কিন্তু গোহত্যা, এমন পাতকের কথা তাহারা ভাবিতেও পারে না। ইহাই মানুষের স্বভাব এবং ইহা মনুষ্যত্বের একটা অঙ্গ। মনুষ্যত্বের বিচারে বড় অপরাধ প্রশংসনীয়, ছোট অপরাধ দণ্ডনীয়। মুরগী মারিয়া খাইলে আপত্তি নাই, কিন্তু বাজার হইতে সেই মুরগীকে হেঁট মুণ্ডে ঝুলাইয়া গৃহে আনিতে দেখিলে পুলিশে আসিয়া ধরে, বলে মুরগীটাকে কষ্ট দেওয়া হইতেছে। এক হাজার লোককে মারিয়া ফেলিতে পারিলে বীর বলিয়া নাম পড়িয়া যায়, কিন্তু একটা লোক মারিলে ফাঁসির দড়ি গলায় ধারণ করা অনিবার্য্য।

শিরোমণি বলিল—ঠাকুর, কাজটা তো অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে।

—কেন বলুন তো!

—ওটা যে গোরু!

—আচ্ছা, ওটা যদি ছাগল বা মহিষ হইত! তারাও তো জীব।

—জীবহত্যায় তো আপত্তি নাই, আপত্তি গোহত্যায়!

রামলোচন—বলিলেন, মহাশয় আপনার শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিতে পারিলাম না। প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞের কাছে প্রাণিমাত্রেই সমান, অথচ আপনি গোরুতে এবং ছাগলে মহিষে প্রভেদ করিতেছেন।

—আর যদি বলি যে জীবহত্যা মাত্রেই পাপ।

—তা হইলেও শাস্ত্র আমার পক্ষে।

—কেমন?

—হত্যা করার অর্থ কি? দুগ্ধ হইতে নবনীকে পৃথক্ করার মতো দেহ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা এই তো? এ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কি বলিয়াছেন?

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি
নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো।
ন শোষয়তি মারুতঃ।'

তবে, আপনি শোক করিতেছেন কেন?

শিরোমণিও হারিবার পাত্র নহে, বিশেষ অনেকগুলি শ্রোতা সম্মুখে, সে বলিল, কিন্তু তার আগের শ্লোকটি স্মরণ করুন।

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।'

তারপরে শামুকের খোলা হইতে মস্ত এক টিপ নস্য লইয়া বলিল, "নরোঽপরাণি"—কিনা "নরঃ" অর্থাৎ কিনা মানবঃ! বুঝিলেন, গীতা মানুষ সম্বন্ধেই হত্যা পাপ নয় একথা বলিয়াছেন।

—অন্য প্রাণী সম্বন্ধে নয় কেন?

—তারা যে ইতর প্রাণী।

—শ্রেষ্ঠ প্রাণী হত্যা যখন হত্যা নয়, ইতর প্রাণী হত্যা কি ভাবে হত্যা হইতে পারে?

—তার কারণ ইতর প্রাণীর অপর দেহে সঞ্চারিত হইবার মতো অবিনশ্বর আত্মা নাই।

—আত্মাই যখন নাই, তখন আর হত্যা করিলাম কাকে? দেহীকে তো হত্যা করা যায় না, বড় জোর বলিতে পারেন, গোবৎসটা চঞ্চলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এখন জড়ভাবে শায়িত আছে।

তারপরে রামলোচন বলিলেন, শিরোমণি মশাই, আপনি প্রাকৃত জন নন, আপনি শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত, আপনার মুখে হত্যার অভিযোগ শোভা পায় না।

বাস্তবিক শোভা পায় না, কারণ শ্রীগীতার এতাদৃশী ব্যাখ্যা শিরোমণির পাণ্ডিত্যের অতীত। সে মুগ্ধ হইয়া, রামলোচনের পায়ের উপরে পড়িল বলিল, আপনি শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

রামলোচন বলিলেন, একি! একি! আপনি আমার গুরুজন।

তখন দুইজনের মধ্যে পরস্পরের পায়ের ধূলা লইবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। জনতা সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেল, বুঝিল, গোহত্যা হয় নাই, গোহত্যা হয় না, তবে আগে বাছুরটা চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, এখন জড়বৎ শায়িত আছে মাত্র। জনতার পক্ষে শাস্ত্র বুঝিবার প্রয়োজন হয় না, তাহারা শাস্ত্রের প্রতিক্রিয়ামাত্র লক্ষ্য করিয়া থাকে। এক্ষণে তাহারা স্পষ্টই দেখিল প্রতিক্রিয়া কি! চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বৃদ্ধ শিরোমণি যুবক রামলোচনের পদধূলি লাভের জন্য কি উৎকট চেষ্টিত।

রামলোচন ধরিলেন, ঠাকুর এবার আমাকে দীক্ষা দিন। শিরোমণি বলিল, যদিচ তুমি পাণ্ডিত্যে আমার চেয়ে বড় কিন্তু আমি যে বিশেষ বিদ্যার অধিকারী তাহাতে তুমি শিশু, কাজেই তোমাকে শিষ্য করিয়া লইবার অধিকার আমার

আছে। তা'ছাড়া তোমাকে এতদিন দেখিলাম, দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। আমার অনেক শিষ্য আছে, কিন্তু কেহই তোমার মতো পণ্ডিত নয়। আর জ্ঞানবলে এবং বাহুবলে এমন অভূতপূর্ব্ব সংমিশ্রণের কথা কাহারও মনে আসে নাই। অতএব আমি তোমাকে অবশ্যই দীক্ষা দিব—আর নিশ্চয় জানি যে তোমা হইতেই আমাদের এই বিদ্যা ও ব্যবসায় নূতন গৌরব লাভ করিবে।

তখন শিরোমণি খড়ি পাতিয়া গণনা করিয়া বুঝিল যে সেই রাত্রিই দীক্ষাদানের অতিশয় প্রশস্ত লগ্ন।

সে বলিল—বৎস রামলোচন, আজ রাত্রি দীক্ষাদানের সুলগ্ন। কাজেই তুমি স্নান, উপবাস ও সংযমের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকো। রাত্রির দ্বিতীয় যামে তোমাকে লইয়া আমি দীক্ষার্থ প্রস্থান করিব।

আজ রামলোচনের আশাতরু মুঞ্জরিত হইতে চলিয়াছে, শুধু তাই নয়, কেবল ডালে ডালে ফুল যে শুধু ফুটিয়াছে তাই নয়, শাখায় শাখায় কোকিলাদি গীতপ্রবণ বিহঙ্গাদিও কূজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি ভাবিলেন—অহো, আজ আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল।

যথাসময়ে শিরোমণি আসিয়া রামলোচনকে ডাকিল। রাত্রি তখন প্রায় দ্বিতীয় প্রহর।

শিরোমণি বলিল—চলো বৎস!

—কোথায়?

—লোকালয়ের বাহিরে মহাপ্রান্তরে ?

—লোকালয়ে নয় কেন গুরুদেব? এ বিদ্যাতো লোক-সমাজের জন্যই উদ্দিষ্ট।

—সব বিদ্যারই উদ্দেশ্য লোকসমাজ। কিন্তু সাধনার স্থান লোকালয় নয়, লোকালয়ে সাধনার বিঘ্ন অবিরল। ভাবিয়া দেখো কোন্ মহাসাধক না সাধনপর্ব্ব লোকালয় হইতে দূরে অতিবাহিত করিয়াছেন। আমাদের সাধনাও মাঠে ঘাটে, বনে বাদাড়ে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, তাহার দীক্ষাও নির্জ্জন স্থানে।

রামলোচন বুঝিলেন শিরোমণির কথাই যথার্থ। তিনি শিরোমণির পিছু পিছু মাঠের দিকে চলিলেন।

অনেকক্ষণ চলিবার পরে তাহারা মাঠের মধ্যে এক বটবৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শিরোমণি বলিল—এই দীক্ষার স্থান।

রামলোচন শুধাইলেন—ঐ উঁচু জায়গাটা কি ?

—ওটি আমার গুরুর সমাধি ?

—আপনার গুরু ! কই, আগে শুনি নাই তো ?

—না শুনিলেও তিনি ছিলেন। গুরু না থাকিলে আমি এ বিদ্যা পাইলাম কোথায় ?

—তাঁহার বৃত্তান্ত সবিশেষ বলুন।

—অবশ্যই বলিব, দীক্ষার সেটিও একটি অঙ্গ। আগে অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করি।

এই বলিয়া সে রামলোচনকে পরিবার জন্য পট্টবস্ত্র, নামাবলী ও খড়ম দিল, আর নিজে যজ্ঞাগ্নি প্রস্তুত করিতে লাগিল। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে দীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সে রামলোচনের হাতে দুটি হরীতকী ও কয়েকখণ্ড তাম্র-মুদ্রা দিল; বলিল, নামাবলীর প্রান্তে বাঁধিয়া রাখো, দীক্ষান্তে উহা আমাকে গুরুপ্রণামী দিবে। তারপরে বলিল, এবারে স্থির হইয়া উপবেশন করো—এবং অবধানপূর্ব্বক আমার গুরুর পুণ্য-জীবনকাহিনী শ্রবণ করো।

এই বলিয়া সে আরম্ভ করিল—আমার গুরুর নাম চন্দন সিং। তিনি বিদ্রোহী শোভা সিংএর পৌত্র। পিতামহের গুণ অনেক সময়ে পৌত্রে বর্ত্তিয়া থাকে, খুব সম্ভব সেই নিয়মানুসারে শোভাসিংহের বীরত্ব চন্দনসিংএ বর্ত্তিয়াছিল। শোভাসিংএর মতোই চন্দন সিং নিজ কালের শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। তবে কালের পরিভাষায় লোকে শোভা সিংকে বলিত বিদ্রোহী এবং বীর, আর চন্দন সিংকে বলিত ঠ্যাঙাড়ে; শোভা সিং নিজ কালের শ্রেষ্ঠ বীর, চন্দন সিং নিজ কালের শ্রেষ্ঠ ঠ্যাঙাড়ে। তাঁহার সহিত কিরূপে আমার সাক্ষাৎকার ও পরিচয় সে কথা থাক্। শুধু একটি তর্কের বিচার করা আবশ্যক। চন্দন সিং ঠ্যাঙাড়ে, আমি ফাঁস্থড়ে, এরূপ স্থলে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব? বস্তুতঃ প্রারম্ভে আমিও ঠ্যাঙাড়ে ছিলাম, গুরুর কৃপাতে এবং উপদেশে ফাঁস্থড়ে হইয়াছি, কেন হইয়াছি শোনো।

আজ যেমন দীক্ষার পূর্ব্বে তোমাকে আমি উপদেশ দিতেছি, আমার গুরুও তেমনি দীক্ষার পূর্ব্বে আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন—বৎস তারাচাঁদ, তোমরা বাঙালী ; এই ঠ্যাঙাড়ে ব্যবসা তোমাদের প্রকৃতির অনুকূল নয় ; ঠ্যাঙাড়েপনা কেবল গায়ের জোর, ওর মধ্যে সূক্ষ্মতা, সুরুচি ও বৈদগ্ধ্য নাই ; অথচ তোমরা বাঙালী ঐসব গুণের জন্যই ভারত-বিখ্যাত। দেখ-না কেন, একটা হিন্দুস্থানী বা বিহারীর সবচেয়ে পুষ্ট তাহার বাহু দুইখানি। ও তো ঠ্যাঙা ধরিবার জন্যই বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন। আর বাঙালীর দুর্ব্বল শরীরের উপরে প্রকাণ্ড মাথাটা—পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মতো সর্ব্বদাই কেমন টলমল করিতেছে। ঐ সদ্যঃপাতী মাথাটার সম্মানরক্ষা করা চাই তো! তাই চন্দন সিং বলিলেন—বৎস, তোমাকে দীক্ষা দিলাম বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সমাজের প্রতিভার অনুকূল অস্ত্র গ্রহণের স্বাধীনতাও তোমাকে দিলাম।

তারপরে গুরুর কৃপায়, নিজের প্রতিভাবলে এবং বাঙালী-সমাজের আন্তরিক অনুপ্রেরণায় আমি ঠ্যাঙাড়ে হইতে ফাঁসুড়ে হইয়াছি। একথা অবশ্যই স্বীকার করিবে যে, স্থূল ঠ্যাঙাড়েপনার চেয়ে সূক্ষ্মতর ফাঁসুড়েপনা আমাদের স্বভাবের অধিকতর অনুকূল।

তারপরে তারাচাঁদ শিরোমণি আবেগদীপ্ত কণ্ঠে ভাবী শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিল—বৎস রামলোচন, তুমি অসীম প্রতিভার অধিকারী, তোমা হইতে বাঙালীসমাজ নূতন অর্থ ও

পদবী লাভ করিবে, তোমাকে আজ আমার দীক্ষাপূর্ব্ব উপদেশ ও পরামর্শ এই যে, সাধনার দ্বারা আরও সূক্ষ্মতর কোন পন্থার আবিষ্কার করো। কালের পরিবর্ত্তন হইতেছে, সুবে বাংলায় কোম্পানীর শাসন ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। উহারা বিদেশী ও বিধর্ম্মী। হিন্দুস্থানের সাধনা ও ধর্ম্মের সঙ্গে উহারা না পরিচিত, না সহানুভূতিপরায়ণ; ঠ্যাঙাড়ে ধরা পড়িলে উহারা ফাঁসি দেয়, ফাঁস্থড়েকেও ছাড়ে না। তাছাড়া দেখ বাঙালীসমাজ ক্রমেই অধিকতর সূক্ষ্মগ্রাহী হইয়া উঠিতেছে; আগে তাহারা টোলে ও পাঠশালায় পড়া সাঙ্গ করিত, এখন ইংরাজি পাঠশালায় প্রবেশ করিতেছে; আগে উহারা সাহেবের বাড়ী সিঁধ কাটিত, এখন তাহাদের মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান হইতেছে; আগে উহারা বিধবাকে পোড়াইয়া মারিত, এখন বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়, তাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে; আগে সভামধ্যে বাঙালী রসিক স্থূল অশ্লীল কথা বলিত, সকলে হাসিত, হাসিয়া ভুলিয়া যাইত; এখন বাঙালী সাহিত্যিক সেই অশ্লীলতাই ইঙ্গিতে ইশারায় সমস্ত দেশময় ছড়াইয়া দিতেছে, লোকে ফুসফুসে বহন করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। বৎস রামলোচন, এমনি কত পরিবর্ত্তন দ্রুত ঘটিতেছে। ফাঁস্থড়ে বৃত্তি ঠ্যাঙাড়েপনার চেয়ে সূক্ষ্মতর হইলেও, আরও সূক্ষ্ম আবশ্যক। অতএব দীক্ষার পরে সেই সাধনায় আত্মনিয়োগ করো।

রামলোচন শুধাইলেন—গুরুদেব, আপনার গুরুদেবের কি হইল?

—সে এক আশ্চর্য্য কাণ্ড। আমাকে দীক্ষাদানের অব্যবহিত পরেই এক দিব্য রথে আরোহণ করিয়া তিনি সাধনোচিতধামে প্রস্থান করিলেন।

রামলোচন বলিলেন—সত্যই আশ্চর্য্য কাণ্ড!

তারপরে তারাচাঁদ যথাশাস্ত্র রামলোচনকে দীক্ষা দিল; দীক্ষান্তে ফাঁস লাগাইবার বস্ত্রখণ্ড তাহার হাতে প্রদান করিল; রামলোচন তাহাকে প্রণাম করিয়া গুরু-প্রণামী হাতে অর্পণ করিলেন। গুরু যখন শিষ্যের প্রণামী উত্তরীয় প্রান্তে বাঁধিতেছে ঠিক সেই সময়ে রামলোচন ক্ষিপ্রহস্তে, অতর্কিতে ফাঁস আঁটিয়া দিয়া গুরুকে সাধনোচিতধামে প্রেরণ করিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা এমন বিদ্যুদ্‌গতিতে ঘটিয়া গেল যে শিষ্যের অসামান্য সাফল্যের জন্য তারিফ করিবার সময়টুকু পর্য্যন্ত গুরু পাইল না। তখন রামলোচন গুরুর প্রাণহীন দেহ গুরুর গুরুর পাশে সমাধিস্থ করিয়া শেষরাত্রে গুরুগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

ক্ষান্ত শুধাইল—দাদা কোথায়?

রামলোচন বলিলেন—সে এক আশ্চর্য্য কাণ্ড পিসি! দীক্ষা-দানের অব্যবহিত পরেই এক দিব্যরথে চড়িয়া তিনি সশরীরে স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

ক্ষান্ত বলিল—ঠিক এইভাবেই, এই রকম একখানা রথে চড়িয়াই তাঁহার গুরুদেবও স্বর্গে গিয়াছিলেন।

—সেইরকম রথ নয় পিসি, সেইরকম রথ নয়, একেবারে ঠিক সেই রথখানাই! গুরুদেব ডাকিয়া বলিলেন কিনা!

—আর কিছু বলিলেন ?

—বলিলেন, বাবা রামলোচন, তুমি কেবল আমার শিষ্য নও, আমার জামাতাও বটে ; ফিরিয়া গিয়া বিস্তিকে বিবাহ করিও, এখন হইতে আমার বাড়ী ঘর, বিষয় সম্পত্তি সবই তোমার !

—আমার সম্বন্ধে কিছু বলিলেন কি ?

—বলিলেন বই কি পিসি। গুরুদেব বলিলেন—ক্ষান্ত তোমার কথা শুনিয়াই চলিবে, আর যদি তা না চলে তবে তাকে কাশী পাঠাইয়া দিও।

তারাচাঁদের মৃত্যুতে ক্ষান্ত ও বিস্তি চারদিন কাঁদিল, তবে দুইজনের কান্নার কারণ হয় তো এক নয়।

দেশের লোকে শিরোমণি মশাইএর সশরীরে স্বর্গারোহণের সংবাদ শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিল—হবে না কেন, উনি কি অল্প লোককে স্বর্গে পাঠাইয়াছেন।

দলের লোকে ভাবিল, শিরোমণি মশাই আমাদের একেবারে অনাথ করিয়া যান নাই, জামাতাবাবাজীকে রাখিয়া গিয়াছেন, শিরোমণির বিবেচনা আছে।

সাধনা

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামলোচন চক্রবর্ত্তী (মতান্তরে, সেন) এখন রাম ফাঁসুড়ে নামে রাঢ়বঙ্গের ত্রাস। এতদিনে তিনি সম্পূর্ণ প্রকট হইয়াছেন। সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে একটা সময়ের ব্যবধান স্বাভাবিক, রাম ফাঁসুড়ে এখন স্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে উড়িষ্যার সীমান্ত অবধি আর পশ্চিমে বাংলার সীমা ছাড়াইয়া ঝাড়খণ্ড অবধি তাঁহার নামে কাঁপে। তখন মানভূম সিংভূমের অধিকাংশ এবং ঝাড়খণ্ডের অধিকাংশ অনধ্যুষিত আরণ্য অঞ্চল ছিল। দস্যুপ্রকৃতির লোকে সেখানে বাস করিত। তাহারা রাম ফাঁসুড়ে বা রামপণ্ডিতের নামে এমনই ভীত ছিল যে তাঁহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার আশায় রঙ্কিণী কালী ও পাথরোলের কালীর কাছে নিয়মিত নরবলি দিত। উভয়েই জাগ্রত দেবী, ভক্তের নিকট হইতে নিয়মিত পূজা গ্রহণ করেন, কখনো মনস্কামনা পূর্ণ করেন না।

এদিকে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ রাঢ়বঙ্গে অর্থাৎ হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় কার্য্যতঃ রাম ফাঁসুড়েই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তখনো ঈস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানীর শাসন ব্যাপকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই; যেখানে থানাপুলিশ, মহকুমা বা সদর সেখানে রাম ফাঁস্থড়ে বড় উৎপাত করিতেন না, কিন্তু কোম্পানীর প্রতাপের বাহিরে যে বিস্তৃত ভূখণ্ড ছিল সেখানে রাম ফাঁস্থড়ে একাই থানা পুলিশ আইন আদালত। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, তাঁহার অনুগত লোকের সংখ্যা আশী হাজার হইতে নব্বই হাজারের মতো হইবে। সে আমলে এই অঞ্চলের লোক-সংখ্যা স্মরণ করিলে ৮০।৯০ হাজার লোকসংখ্যাকে বিস্ময়কর বলিতে হইবে। অনেকের ধারণা এই যে, গড়ে প্রত্যেক দশ জনের মধ্যে একজন রাম ফাঁস্থড়ের অনুগত ছিল। অথচ তাঁহার গুরু তারাচাঁদ শিরোমণির মৃত্যুকালে তাহার অনুগত লোকের সংখ্যা বড়জোর ৭।৮ হাজার ছিল। এ সব তথ্য মনে রাখিলে রাম ফাঁস্থড়েকে একজন "People's Man" বা গণাধিনায়ক বলিতেই হইবে।

এবারে তাঁহার প্রভাবপ্রতিপত্তি-বৃদ্ধির কারণ আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথম কারণটি বিস্ময়কর মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। রাম পণ্ডিতের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁহার দল-বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ। পণ্ডিতসমাজে পাণ্ডিত্যের প্রভাব তেমন লক্ষ্য করিবার মতো নয়; ডাঙার জীবের কাছে কুম্ভীরের যে স্থান, জলে তাহার শতাংশের একাংশও কি? বরঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাণ্ডিত্য ছাড়া পণ্ডিতেরা আর সব গুণই বাঞ্ছনীয় মনে করেন;

কলেজের অধ্যাপক রাগিয়া গেলে পুত্রকে গাল দেন "মরিস বেটা কলেজের প্রোফেসার হয়ে।" তাঁহার পুত্র মোটা বেতনের কারিগর হইলে উপযুক্ত বেটার বাপ মনে করিয়া তিনি গৌরব বোধ করেন। ইহাই স্বাভাবিক, কারণ আয়ত্ত বিষয় মানুষের কাছে তুচ্ছ মনে হয়, করতলগত আমলক লোষ্ট্রখণ্ড মাত্র।

কিন্তু অপণ্ডিত সমাজে অর্থাৎ যেখানে বিদ্যার প্রয়োজন আছে বলিয়া কেহ মনে করে না, সেখানে পণ্ডিতের বড় খাতির। পেশাদার থিয়েটারে অভিনেতাদের মধ্যে যদি কেহ বি-এ পাশ থাকে তবে তাহার বড় সম্মান, সকলেই আড়ালে ফিসফিস করিয়া কানাকানি করে 'উনি একজন বি-এ'; অন্যের বেলায় যাহাই হোক, তাহার বেতন তিন মাসের বেশি বাকি পড়ে না, যদি চলিয়া যান।

এই সব তথ্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, যথা-স্থানে, অর্থাৎ বিদ্বৎসমাজের বাহিরে, এখনো বিদ্যার খাতির আছে। এবং সেই খাতির রাম ফাঁস্থড়ের প্রভাববৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। যে ব্যক্তি ফাঁস আঁটিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে একটা লোককে মারিয়া ফেলিতে পারে সে যে বিদ্বান্ ইহা বিশ্বাস করিবার কথা নয়। কিন্তু সত্যই অনুরূপ প্রমাণ হইয়া গেলে তখন মণিকাঞ্চনের সান্নিধ্যে পরস্পরের মহিমা বাড়িয়া যায়। রাম পণ্ডিত কলেজের দিগ্গজ অধ্যাপক

হইলে কেহ ফিরিয়াও দেখিত না, এখানে সকলেরই মুখে —ঠাকুর মশাই, পণ্ডিত মশাই।

আবার বিপরীতটাও সত্য ; একজন এম-এ পাশ অধ্যাপক যদি পর পর পি-আর-এস্, পি-এইচ-ডি-র দোতালা তেতালা খাড়া করে কেহ বিস্মিত হয় না, কিন্তু যদি জানাজানি হইয়া যায় লোকটা গাঁট কাটে বা চোরাই মদ চোলাই করে, তবে সতীর্থ-সমাজে তাহার সম্মান বৃদ্ধি পায় ; তাহারা বলে লোকটা কেবল মাছি-মারা পণ্ডিত নয়, খুব প্র্যাকৃটিক্যাল, এমন না হইলে আর আজকালকার যুগে—ইত্যাদি ; আসল কথা, বিদ্যাকে তেমন করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে আজও তাহার সার্থকতা দেখা যায়। তবে যে লোকে অবিশ্বাস করে তাহার কারণ, হয় তাহারা অস্থানে বিদ্যার প্রয়োগ করে, নয় অস্থানে বিদ্যার প্রয়োগ দেখে।

রাম ফাঁস্নড়ের দল-বৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ, তাঁহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দল গড়িবার শক্তি। শিরোমণি হাতুড়ের মতো কাজ করিত, না ছিল তাহার ব্যক্তিত্ব, না ছিল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান। রাম পণ্ডিত পূর্ব্বপন্থা একেবারে পরিহার করিলেন এবং বড় বড় সাধু-সন্ন্যাসিগণের নিকট হইতে দল গড়িবার ছাঁচটি গ্রহণ করিলেম। পেশাদার সাধু-সন্ন্যাসিগণের দুই শ্রেণীর ভক্ত থাকে, গৃহী ও সন্ন্যাসী ; গৃহীরা গৃহে থাকে, ডাকিলে আসে এবং সাধ্যমতো অর্থাদি দিয়া সাহায্য করে —আর সন্ন্যাসীরা মূল সাধুর সঙ্গে বা মূল সাধু কর্তৃক

প্রতিষ্ঠিত মঠ ও আশ্রমাদিতে থাকে, তাহারা প্রচার দ্বারা গুরুর কার্য্যসাধন করে।

রাম ফাঁসুড়ে এই ছাঁচ বা কাঠামোতে দল বাড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার গৃহী ভক্তের সংখ্যাই বেশি, কিন্তু সন্ন্যাসিগণ সংখ্যায় কম হইলেও তাহারাই 'Dominant minority'! ফাসিস্ত, নাৎসী ও কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে তাহারা সকলেই ভারতের এই ব্যবস্থাপনা হইতে নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় ও দলীয় আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবাসী হিসাবে ইহা আমাদের কম গৌরবের বিষয় নয়।

ভাগীরথীর পশ্চিমতীর হইতে আরম্ভ করিয়া তীর্থযাত্রার যে প্রাচীন পথ ছিল তাহা মেদিনীপুর পর্য্যন্ত আসিয়া দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে: এক শাখা গিয়াছে দক্ষিণে শ্রীক্ষেত্রে; আর এক শাখা গিয়াছে পশ্চিমে গয়া, কাশী প্রভৃতি স্থানে। এই দুই পথের পাশে পাশে ঠ্যাঙাড়ে ও ফাঁসুড়ের গ্রাম ছিল। শিরোমণি বহু ঠ্যাঙাড়ে উচ্ছেদ করিয়াছিল; রাম ফাঁসুড়ে এখন তাহাদের সবংশে উচ্ছেদ করিলেন, অর্থাৎ তাহারা ঠ্যাঙাড়েপনা ছাড়িয়া ফাঁসুড়ে বৃত্তি গ্রহণ করিল।

এইরূপে দুটি মূল রাজপথ প্রথমে স্ববশে আনিয়া দেশের অভ্যন্তরের শাখা-রাজপথগুলিও তিনি স্ববশে আনিয়া ফেলিলেন, কেবল বাধা হইয়া রহিল কোম্পানীর পুলিশ ও সিপাহী। রাম ফাঁসুড়ে People's man, কিন্তু গোঁয়ার নন; তিনি জানিতেন কোম্পানীর প্রতিস্পর্দ্ধা করিবার সময়

এখনও আসে নাই, তবে আরও জানিতেন যে জনগণের উপর প্রভাববিস্তার সম্পূর্ণ হইলে গভর্মেণ্ট আপনিই তাঁহার কবলে আসিয়া পড়িবে; জানিতেন এসব বড় কাজ তলা হইতে সুরু করিতে হয়, তলা হইতে ঢুঁ মারিয়া জলমগ্ন পাহাড় যেমন লোহার জাহাজ বানচাল করিয়া দেয়—প্রয়োজন কেবল সুযোগের এবং সহিষ্ণুতার।

বলা বাহুল্য, কেহই রাম ফাঁসুড়ের বেতনভুক ছিল না, গৃহীরা তো নয়ই, এমন কি সন্ন্যাসীরাও নয়; গৃহীরা চাষ-বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য করিত, এটা তাহাদের জীবিকা; উপজীবিকা ফাঁসুড়ের সাকরেদি। সন্ন্যাসী ভক্তদের অর্থাৎ যাহাদের নিজেদের ঘরবাড়ী বা সংসার ছিল না তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসস্থান দিবার ভার গ্রামগুলির উপরে ন্যস্ত ছিল; গ্রামের আয়তন অনুসারে, কোন গ্রামে দশ জন, কোন গ্রামে বিশ জন, কোন গ্রামে পঞ্চাশ জন সন্ন্যাসী থাকিত। প্রত্যেক গ্রামের নিজ অঞ্চলের উপরে পূর্ণাধিকার; সেই গ্রামের এলাকায় ফাঁসুড়ে-বৃত্তি করিয়া যে আয় হইত তাহার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ গৃহী ভক্তদের, পঁচিশ ভাগ সন্ন্যাসী ভক্তদের—বাকি পঁচিশ ভাগ রাম ফাঁসুড়ে পাইতেন। প্রকাণ্ড সুযোগ ছাড়া নিজে বড় বাহির হইতেন না, কিন্তু রাঢ়বঙ্গে যেখানে যত "কাজ" হোক না কেন, শতকরা পঁচিশ ভাগ ফাঁসুড়ের তহবিলে পৌঁছিবেই, জীবন-বীমার অর্গানাইজারগণের ভাগে যেমন 'ওভার-রাইডিং' প্রিমিয়াম জুটিয়া থাকে।

তীর্থপথ দুটি ফাঁস্থড়ে খাস অধীনে রাখিয়াছিলেন, বাকি শাখা-রাজপথগুলি দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে বাঁটিয়া দিয়াছিলেন, অনেকটা জায়গীরদার প্রথার মতো। এইভাবে ফাঁস্থড়ের রাজ্য, ব্যবসা ও জীবনযাত্রা চলিতেছিল। বৎসরে একবার, শীতকালে তাঁহার শ্বশুরালয়ে, এখন নিজ বাড়ীতে, "সারা রাঢ়বঙ্গ ফাঁস্থড়ের মেলা" বসিত। অবশ্য লোকে ফাঁস্থড়ে শব্দটা প্রয়োগ করিত না, বলিত "সারা বাংলা রাম ঠাকুরের মেলা।" মেলায় বড় ধুমধাম হইত—যাত্রা, ঝুমুর, নাচগান, কবি, পাঁচালী, কিছুই বাদ যাইত না। মেলার কয়দিন রাম ফাঁস্থড়ে সকলকে আহার্য্য জোগাইতেন, একেবারে "দীয়তাং ভুজ্যতাং" ভাব, তখন রাম ফাঁস্থড়ে দয়া-দাক্ষিণ্যের মূর্ত্তি। সারা বাংলার বিভিন্ন গ্রাম রাম পণ্ডিতকে নজর ও ভেট জোগাইয়া তাঁহার "কাজে"র হাত হইতে অব্যাহতি মাগিয়া লইত। লোকের চক্ষে রাম ফাঁস্থড়ের এখন রাজকীয় মর্য্যাদা। শক্তিমান ফাঁস্থড়ে মাত্রেই রাজা।

একদিন সকালবেলায় রাম পণ্ডিত ও তাঁহার স্ত্রী বিন্তির মধ্যে কথোপকথন হইতেছিল। বলা বাহুল্য, বিন্তি এখন বিনোদারাণী; স্বামীর মহত্বকে অন্য কোন উপায়ে অনুসরণ করিতে না পারিয়া দেহটাকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া আড়াইমণি মাংসপিণ্ডে পরিণত করিয়াছে।

বিনোদারাণী বলিল—কিগো, তোমার লোক বুঝি কাশী হইতে আর ফেরে না! কাশী পাইল নাকি?

রাম পণ্ডিত বলিলেন—তোমরা তো ঘরের বার হও না—কাশী কি বামুনপুকুর যে, দিনের মধ্যে যাতায়াত করা যাইবে?

বামুনপুকুর তারাচাঁদের পৈতৃক নিবাস ছিল, এ গ্রামে আসিয়া সে নিজে বাড়ী করিয়াছিল।

নিজের পৈতৃক গ্রামকে কাশীর সঙ্গে উপমিত হইতে শুনিয়া সকালবেলাতেই বিনোদারাণী জ্বলিয়া উঠিল—মর্ মিন্‌সে, আমার পৈতৃক গ্রাম কাশী!

তারপরে একটু থামিল, বলিল—হইবেও বা, নইলে এমন ষাঁড় জুটিবে কেন?

—রাগ করিও না বিন্তি, আমি তো হেয় করি নাই।

—আরে ম'ল যা, আমিই কি হেয় করিয়াছি? তোমাকে কাশীর ষাঁড় বলিয়াছি ওতে কাশীর ষাঁড়গুলাই রাগ করিতে পারে—তারা তো ফাঁস্থড়েগিরি করে না।

—তোমার বাপই তো আমার গুরু!

—ফের বাপ তুলিয়া কথা?

—আচ্ছা, তবে থাক।

—সেই ভালো। কিন্তু এখন বলো, আমার মকর-মুখো বালা কবে পাইব?

—লোক ফিরিলেই সেই সঙ্গে আসিবে।

—এত দেরীতে সন্দেহ হইতেছে—

—তবে শোন বলি, কাশী একজন পুরুষের যাতায়াতে চার মাসের পথ। কিন্তু সঙ্গে আছে তোমার পিসি, একে মেয়েমানুষ তার উপরে বুড়ী—ছ'মাসের কমে যে লোক ফিরিতে পারিবে তা মনে হয় না।

—তবে এত দেরী করিলে কেন? বাবার স্বর্গ পাওয়ার পর থেকেই পিসিকে কাশী পাঠাইবার কথা বলিতেছি। তা আজ না কাল, আজ না কাল, দশ বছর গেল।

—ওরে বিন্তি, দশ বছর আগে তোকে বালা গড়াইয়া দিলে আজ যে তা আংটিতে পরিণত হইত।

—দেখ, গা-গতর তুলিয়া কথা বলিও না।

মুখে কথা না বলিলেও ওটি রাম পণ্ডিতের একটি প্রকাণ্ড সমস্যা। বিন্তির অলঙ্কারের প্রতি বড় লোভ, কোন্ স্ত্রীলোকেরই বা নয়, কিন্তু বিপদ এই যে, বিন্তির শরীরের স্বাভাবিক স্ফীতির রেট এমন অস্বাভাবিক যে, ছ'মাসের মধ্যে অনন্ত বালাতে এবং বালা আংটিতে পরিণত হয়, আর গলার হার গলায় ফাঁসের মতো আঁটিয়া বসে।

বিন্তি বলিল—এখন নিশ্চয় বলো লোক কবে ফিরিবে?

কিছুক্ষণ হিসাব করিয়া রাম পণ্ডিত বলিলেন, বোধ করি আর দেরী নাই। রথের দিন পিসি কাশীযাত্রা করে আর এদিকে কালীপূজা গেল! এতদিনে তো ফেরা উচিত।

এবারে বিন্তি কণ্ঠে সরসতা আনিয়া বলিল—হাঁ গো, কাশীর মকরমুখো বালা কেমন?

—চমৎকার, বিন্তি, চমৎকার। তোমাকে যা মানাইবে মনে হইবে আর কারো জিনিস পরিয়াছ।

—তবে রে—

এ-রকম একটি আক্রমণ হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াই রাম পণ্ডিত প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন, চাদরের ভিতর হইতে এক জোড়া সোনার বালা বাহির করিয়া বলিলেন, দেখ তো কেমন?

মুহূর্ত্ত মধ্যে বিন্তির মুখে যে ভাববিপর্য্যয় ঘটিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতারও তাহা অনুকরণের স্থল; আর সেই স্থূলাঙ্গী গতির যে ক্ষিপ্রতা দেখাইল, যে কোন শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকীর অনুকরণের যোগ্য।

একলম্ফে স্বামীর হাত হইতে বালা দুটি ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া বলিল—মন্দ নয়, আমাকে বেশ মানাইবে।

তারপরে সে এক ঠেলাঠেলি রক্তারক্তি কাণ্ড—বালা দুটি প্রকোষ্ঠে ঢুকাইবার চেষ্টা হইতেছে কিন্তু স্ফীত মাংসপিণ্ড সে পক্ষে অন্তরায়। অবশেষে নারীর সহিষ্ণুতারই জয় হইল। হইবেই বা না কেন, ইহারাই তো জ্বলন্ত চিতায় সজ্ঞানে পুড়িয়া মরিয়া স্বর্গলাভের পুণ্য অর্জ্জন করিয়া থাকে।

পাছে আর কোন অপ্রিয় প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ে তাই বিনোদারাণী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—যাই অনেক কাজ বাকি, বসিয়া বসিয়া গল্প করিবার সময় আমার নাই।

এই বলিয়া সে সরিয়া পড়িল।

রাম পণ্ডিত মনে মনে ভাবিলেন, ধন্য, ধন্য স্বর্ণচক্র, যাহার কৃপায় এত সহজে দুর্দ্দান্ত নারীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়!

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে একদিন ভোরবেলা মথুরা সিং শুক্‌না মুখে, ছেঁড়া জামা-কাপড়ে, সর্ব্বাঙ্গে আঘাতের দাগ লইয়া রাম পণ্ডিতের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাম পণ্ডিত চমকিয়া শুধাইলেন, মথুরা, একি কাণ্ড! মথুরা সিংএর সঙ্গে পিসি কাশী যাত্রা করিয়াছিল।

মথুরা সিং বলিল—মান গিয়া, জানভি জানা আচ্ছা হায়।

বিপৎকালে মথুরা সিংএর মুখে বহুদিনের বিস্মৃত মাতৃভাষা বাহির হয়।

—কি ব্যাপার খুলিয়া বলো।

—হুজুর, পিসিমাকে কাশীজীতে রাখিয়া তো লৌট আসিতেছি, দেশে প্রায় ফিরিয়াছি, এমন সময় মানভূমের পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে এক ডাকুর দল।

—মারিয়া কাড়িয়া লইল?

—সব হুজুর!

—গয়াপ্রসাদ আর কুঞ্জ সিং কোথায়?

—গয়াপ্রসাদ তো কাশী পাইল! আর কুঞ্জ সিং ডাকুর হাতে জান দিল!

—আর তুই?

—এহি তো হাল হামারা!

অন্তরাল হইতে বিস্তি কতক কতক শুনিয়াছিল এবং স্ত্রীসুলভ অশিক্ষিতপটুত্বে বুঝিয়া লইয়াছিল যে, ডাকাতের দলের আসল লক্ষ্য জানও নয়, মানও নয়—তাহার মকরমুখো বালাজোড়া, এবং সে লক্ষ্য তাহারা বিদ্ধ করিয়াছে।

বিস্তি তখন পা ছড়াইয়া পাড়া উতলা করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মথুরা সিং বলিল—মা, আপনি বহুৎ কাঁদবেন না, কারণ পিসিমা বহাল তবিয়তে আছেন।

বিস্তির শোকে ঘৃতাহুতি পড়িল। মকরমুখো বালার অভাবও ভোলা যায় কিন্তু ঐযে পুরুষটা একটা উদ্দেশ্য আরোপ করিয়া গেল—বিস্তি শেষে কিনা তিন-কাল-গত একটা পিসির জন্য শোক করিতেছে—ইহা তো অসহ্য।

বাস্তবিক নারীদ্বেষী না হইয়াও অনায়াসে বলা যায় যে, স্ত্রীলোকের কোন বন্ধু নাই। বিবাহের আগে পর্য্যন্ত 'হ্যাঁ-ভাই, না-ভাই, তাই না ভাই' গোছের একপ্রকার সখীত্ব অপর নারীর সঙ্গে থাকে বটে কিন্তু বিবাহ হইয়া যাইবামাত্র পৃথিবীর যাবতীয় নারী, নারীর শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, সে কি শাশুড়ী, কি জননী, কি মাসি পিসি ভগ্নী—অথবা অপরিচিতা। বিবাহিত নারীর জগৎ তাহার পতি পুত্র কন্যা—বাকি সব গ্রহান্তরের মৃত জগৎ।

বিস্তি ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিল—তোমার সব সাজানো কথা! ডাকাত-ফাকাত মিথ্যা—

মথুরা সিং—তবে কি হামি লিয়েছি?

তুই নিবি কেন? আনিতেই দেয় নাই।

সে কি কথা মাইজি, তবে আর কথা সাজানো কেন? এই দেখ না ক্যায়সা মারা!

বেশ করিয়াছে, একেবারে মারিয়া ফেলিলেই ভালো ছিল।

৯

তারপরে স্বামীর উদ্দেশে সে বলিল—তোমার কেবল গাঁয়ের মধ্যে ফুটুঙ-ফাটুঙ! মারিয়া ফাটাইয়া দিল তো মানভূমের চাষা।

রামপণ্ডিত কি আর উত্তর করিবেন, সত্যই তো ঠকিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার সান্ত্বনা এই যে রাঢ়বঙ্গে এই অপমান ঘটে নাই, ঘটিয়াছে বাংলাদেশের বাহিরে। তবু এ ঘটনা পল্লবিত হইয়া রটিতে কতক্ষণ। আর রটিলে কি রাঢ়বঙ্গেও তাঁহার মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে? তিনি স্থির করিলেন মানভূমের ডাকাতকে এমন শিক্ষা দিবেন যে সাতপুরুষে যেন তাহারা ভুলিতে না পারে।

রামপণ্ডিত কয়েকদিন দম ধরিয়া রহিলেন, কাহারো সঙ্গে কথা বলেন না, আহার নিদ্রা নাই। এই অবস্থায় কয়েকদিন চলিল। এমনভাবে তিনি জন্মে অপমানিত হন নাই—ইহার প্রতিকার অবশ্যই করিতে হইবে, নহিলে সারা বাংলাব্যাপী তাঁহার প্রতিপত্তির জাল গুটাইতে কতদিন?

সাধারণ মানুষ অপমানিত হইলে রাগারাগি করে, তর্জ্জন-গর্জ্জন করে, তারপরে কিছুদিন গত হইলে সব ভুলিয়া যায়। কিন্তু মহামতিগণ ও সর্পকুল নিঃশব্দে সুযোগের অপেক্ষা করিয়া থাকে।

রাম ফাঁস্থড়ে তলে তলে অপমানকারীর নামধাম ও বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন। লোকটার নাম ঝগড়ু মাঝি, নিবাস পুরুলিয়ার কাছে—ঐ অঞ্চলেই তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি, দলে লোকও কিছু আছে, কিন্তু কোন দিক দিয়াই রামপণ্ডিতের সঙ্গে তুলনা হয় না।

তখন ফাঁস্থড়ে এক ফন্দি আঁটিয়া মথুরা সিং ও আরও কয়েকজন লোকের হাতে দিয়া লাল কাপড় জড়ানো এক-খানা পলাশ গাছের ডাল ঝগড়ু মাঝির কাছে পাঠাইয়া দিলেন। "ফুল পাতাইবার" বা সখ্যস্থাপনের ইহা আহ্বান। ঝগড়ু মাঝি এতদিন ভয়ে ভয়ে ছিল, না জানিয়া রাম পণ্ডিতের লোকের গায়ে হাত তুলিয়াছে, না জানি কি হয়। এমন সময়ে সখ্যের আহ্বান পাইয়া সে হাতে চাঁদ পাইল।

উভয়পক্ষের মধ্যস্থতায় স্থির হইল যে বাঁকুড়া জেলা ও মানভূম জেলার সীমান্তে কোন স্থানে উভয় বন্ধুর মিলন ঘটিবে।

বাঁকুড়ার প্রান্তে ঝাঁটিপাহাড়ী ক্ষুদ্র গ্রাম। রাম ফাঁস্থড়ে স্থির করিলেন এই গ্রামে তাঁহার দরবার বসিবে—আর মানভূম অঞ্চল হইতে আসিবে ঝগড়ু মাঝি; ব্যাবসায়িক মর্য্যাদায়

সে ন্যূন, কাজেই একটু হীনতা স্বীকার করিয়া সে বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ করিয়া বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে—এইরূপ ব্যবস্থার ঔচিত্য ঝগড়ু সানন্দে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। সংসারে ছোট ফাঁসুড়ে বড় ফাঁসুড়ের আলিঙ্গন পাইবার আশায় অনেক হীনতাই স্বীকার করিয়া থাকে।

বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ রামপণ্ডিত সাঁওতাল ঝগড়ু মাঝির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইবার জন্য চলিয়াছেন সংবাদ পাইয়া সুবে বাংলার বড় বড় স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের স্মৃতিতে জাগিল রামচন্দ্র ও গুহক চণ্ডালের চিত্র, তাহারা রামপণ্ডিতকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া পাঠাইয়া দিল।

ঝাঁটিপাহাড়ীতে রামপণ্ডিতের দরবার বসিয়াছে। দলে দলে লোক আসিয়াছে, কেহ বেচিতে, কেহ কিনিতে, কেহ বা স্রেফ ভিড় দেখিয়া ভিড়িয়া গিয়াছে। আর রামপণ্ডিতের প্রসাদ পাইবার এবং তাহার অত্যাচার হইতে বাঁচিবার আশায় গোয়ালা দধি দুগ্ধ ঘৃত আনিয়াছে,—স্যাকরা অলঙ্কার ও কামার সিঁধকাঠি লইয়া আসিয়াছে। যাহাদের এসব কিছুই নাই, তাহারা নগদ মুদ্রা নজরানা লইয়া আসিয়াছে। পারিষদবর্গ অর্দ্ধেক নিজের ভাগে রাখিয়া বাকি অর্দ্ধেক প্রভুর সম্মুখে স্থাপন করিতেছে, আর পরিচয় দিতেছে—লোকটি আপনার খুব অনুগত। রামপণ্ডিত একবার টাকার দিকে, একবার লোকটির দিকে তাকাইতেছেন। তারপরে একটু মৃদু হাসিয়া বলিতেছেন—"বেশ, চিনিয়া রাখো"—অর্থাৎ

অযথা অত্যাচার করিও না, কিন্তু প্রয়োজনকালে চাপ দিলেই যে পয়সা বাহির হইবে তাহা মনে রাখিও। গ্রামবাসীরা অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি করে নাই, কিন্তু সঙ্গে আরও একটি ব্যবস্থা করিয়াছে, গ্রামের যাবতীয় স্ত্রীলোক ও শিশু অন্যত্র সরাইয়া ফেলিয়াছে। একজন পারিষদ জিজ্ঞাসা করিল—তোমাদের গাঁয়ে যে মেয়েছেলে দেখি না? উত্তর পাইল—হুজুর, 'পরব,' সবাই পিত্রালয়ে গিয়াছে।

কিয়দ্দূরে প্রকাণ্ড সাঁওতাল সমাবেশের মধ্যে ঝগড়ু মাঝির আসর। সেখানে হুড়ুম দুড়ুম মাদল বাজিতেছে, সাদা ফুল খোঁপায় গোঁজা সাঁওতাল রমণীরা নাচিতেছে, সঙ্গে মাদল ও বাঁশীর বাজনা—আর সর্ব্বত্র অবাধে হাঁড়িয়া মদ্য বিতরণ হইতেছে। বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ রামপণ্ডিত হাঁড়িয়া বিতরণের ভার লইয়াছিলেন। কোন পক্ষের সঙ্গে কোন অস্ত্র ছিল না, নিরস্ত্র হস্তই আলিঙ্গনের পক্ষে প্রশস্ত।

সূর্য্য যখন মধ্যগগনে পৌঁছিল, সেই শুভলগ্নে একযোগে একসঙ্গে শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল এবং হাজার মাদল বাজিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে রামপণ্ডিত ও ঝগড়ু মাঝি সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইল। ঝগড়ুর বিশালায়ত বপু, কালো ঝাঁকড়া চুল, পরণে ও গায়ে সাদা ধুতি চাদর, মাথায় লাল ফেটা ও লাল ফুল, গলায় একটি কড়ির মালা, চোখ দুটাও অকারণে লাল নহে; রামপণ্ডিতের দীর্ঘ গৌর দেহ, চুল ছোট, মুখ

শ্মশ্রুগুম্ফহীন, পরণে বস্ত্র, মেরজাই ও উত্তরীয়, সবই গেরুয়া, অন্তরের বৈরাগ্য উপছাইয়া পড়িয়া সব গৈরিক করিয়া দিয়াছে! হাঁড়িয়া প্রভাবে বিচলিতচরণ ঝগড়ু মাঝি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া 'ফুল, তুই বুকে আয়' বলিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া রামপণ্ডিতকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজের গলার কড়ির মালা খুলিয়া লইয়া রামপণ্ডিতের গলায় পরাইয়া দিল; পরাইয়া দিয়া যখন স্খলিত অঙ্গুলিতে সূতা বাঁধিয়া দিতেছে, সেই সময়ে রামপণ্ডিতের উত্তরীয়ের তল হইতে, মেঘান্তর্নিহিত বিদ্যুতের মতো, একটি ফাঁস বাহির হইয়া পড়িল। তাহা অপাঙ্গে নিরীক্ষণ করিয়া বন্ধুর মালা মনে করিয়া ঝগড়ুর অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখা দিল, কিন্তু সে রেখা অধরের অপর প্রান্তে পৌঁছিবার আগেই একটি অব্যক্ত আর্ত্তশব্দ করিয়া রুদ্ধনিঃশ্বাস ঝগড়ুর নশ্বর দেহ ভূতলে পড়িয়া গেল—আরও আগে পড়িতে পারিত, ঝগড়ুর কৃত-আলিঙ্গন বাহুতেই কিছু বিলম্ব ঘটাইয়াছিল।

এই ঘটনা সকলেরই অপ্রত্যাশিত, কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে কেহ 'রা' করিল না, না স্বপক্ষ না বিপক্ষ! এমনি মহত্ত্বের প্রভাব। বরঞ্চ বিপক্ষের অনেক লোক ভূলুণ্ঠিত দলপতির মৃতদেহের বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া রামপণ্ডিতের পায়ের উপর আসিয়া লুটাইয়া পড়িল—বলিল, রাজা, মনে রাখিস্।

অদূরে একটা সাঁওতাল হাঁড়িয়া পান করিতেছিল, সে কেবল সোরগোল শুনিয়াছিল, কি ঘটিয়াছে জানিতে পারে নাই, সে অপরকে শুধাইল, কি হ'ল বটেক ?

অপরে বলিল—রাজাটা মেইলো।

মেইলো ! দেখ তো কলসীটায় কিছু আছে নাকি ?

এই একটি ঘটনাতেই মানভূমের অরণ্যপর্ব্বতে রাম-পণ্ডিতের কীর্ত্তিধ্বজা প্রোথিত হইল। তাঁহার পারিষদগণ সে রাত্রে গ্রামবাসী নারীদের 'পিত্রালয়ে'র সন্ধান লইল। আর সারারাত্রি রামপণ্ডিতের ছাউনির মধ্য হইতে নারীকণ্ঠের আর্ত্তধ্বনির উত্থানপতনের আর বিরাম রহিল না।

ঝগড়ু মাঝির অতর্কিত পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়া আর-একবার সুবে বাংলার স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের স্মৃতিতে পুরাতন কাহিনী জাগিল—এবারে ভবানীর বরপুত্র শিবাজীর হাতে ম্লেচ্ছ আফজলখাঁর পরাজয়ের চিত্র ; স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ আর-একবার রামপণ্ডিতকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া পাঠাইল।

এতদিনে রাম ফাঁসুড়ের খ্যাতি প্রতিপত্তি চূড়ান্তে উঠিল। সুবে বাংলার অর্থাৎ রাজমহল হইতে উড়িষ্যার প্রান্ত আর ভাগীরথী হইতে সুবর্ণরেখা অবধি ভূখণ্ডের কার্য্যতঃ অধীশ্বর রামপণ্ডিত, নামেমাত্র অধীশ্বর কোম্পানী। কোম্পানীর জাঁদরেল সব অফিসার রাতের বেলা রাম ফাঁসুড়ের সামান্য সব অনুচরের হুঙ্কার শুনিয়া দাঁতে-দাঁতে লাগিয়া মূর্চ্ছা

গিয়াছে এমন ঘটনা বিরল নয়। বিশেষ পূর্ব্বকথিত নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতার পর হইতে তাঁহার মাহাত্ম্যও যেন তুঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহার প্রতি সকলের আকর্ষণও বাড়িয়াছে। প্রকাণ্ড রকম অন্যায় যে করিতে পারে তাহার মধ্যে প্রকাণ্ডতা আছে বলিয়াই লোকের বিশ্বাস। স্বল্পজ্ঞ ব্যক্তি জানে যে চাকা ঘোরে বলিয়াই এঞ্জিন চলে, বিশেষজ্ঞগণ জানে চাকা ঘোরায় বয়লারের বাষ্প। দয়া, প্রেম, মায়া, মমতা, সত্য, অহিংসা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি পদার্থ সংসাররথের চাকা; নিষ্ঠুরতা, পরশ্রীকাতরতা, কৃতঘ্নতা, বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, পরস্বাপহরণবৃত্তি, লোভ প্রভৃতি বয়লারের বাষ্প; বিশেষজ্ঞগণ জানে এগুলিই তলে তলে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সংসারযানের চক্রাবর্ত্তন ঘটাইতেছে, রথের প্রগতি ঘটিতেছে, কাজেই প্রগতির মূলে ঐ সব স্পৃহণীয় প্রবৃত্তি।

কিন্তু এত ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তিতেও রাম ফাঁসুড়ের মনে শান্তি ছিল না। মহাপুরুষগণের জীবনে এমন ঘটনা বিরল নয়। বাহিরের সুখের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে অন্তরের অশান্তি তাঁহাদের চিত্তে প্রায়শঃ এক কুরুক্ষেত্রকাণ্ড ঘটাইয়া থাকে।

ইহার কারণ কি? বাহিরের কারণটি গৌণ। অসাধারণ মনীষাবলে তিনি বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে কোম্পানীর সঙ্গে পারিয়া ওঠা যাইবে না, ভবিষ্যৎ কোম্পানীর অঙ্কে শায়িত, প্রমাণস্বরূপ মধ্যপ্রদেশের পিণ্ডারী ভ্রাতৃগণের দমন সংবাদটি তিনি মনে মনে আলোচনা করিতেন।

কিন্তু আসল কারণ ছিল তাঁহার নিজের অন্তরে। সশরীরে স্বর্গে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার দীক্ষাদাতা গুরু শিরোমণি মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন যে ফাঁসুড়ে বৃত্তি আর দীর্ঘদিন চলিবে না, কেন না, একদিকে কোম্পানীর শাসনের দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে মানুষের মনের অধিকতর সুকুমার পন্থার প্রতি আকর্ষণ। আগে যেখানে কালীঘাটের পট হইলে চলিত, এখন সেখানে বিলাতী তেলের ছবি চাই; আগে যেখানে মোটা খাটো গড়া হইলে চলিত, এখন সেখানে বিলাতি মিহি ম্যাঞ্চেস্টারি চাই; আগে দাতাকর্ণ ও শিবি রাজার উপাখ্যানই যথেষ্ট ছিল, এখন শিশুকণ্ঠে "I met a lame man in a lane…" না শুনিলে সুপ্রভাত হয় না; আগে সদ্যোবিধবা পত্নীকে পতির চিতায় পোড়াইয়া মারিত, এখন তাহাকে অপছন্দ হইলে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়াই রীতি; আগে লোকে দশটা বিবাহ করিত, এখন আর বিবাহ করিবার দায়িত্ব স্বীকার করে না, তাই 'বাগানবাড়ী'র সৃষ্টি হইয়াছে; আগে হাতে মারিত, এখন ভাতে মারে; আগে ভাঁড়ে করিয়া মদ্য বিতরণ হইত, এখন পুস্তকে করিয়া বিতরণ হয়, অধিকাংশ প্রকাশকের আড্ডা বে-আইনি মদের চোলাই ঘাঁটী; আগে চিঁড়া ভিজাইতে দই লাগিত, এখন মাত্র কথায় চিঁড়া ভিজিয়া থাকে; আগে বাপ শেখাইত ছেলে শিখিত, এখন ছেলে শেখায় বাপ শিখিয়া থাকে; কত আর দৃষ্টান্ত দেওয়া

যাইবে, ফলকথা সংসারের গতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর। আগে ছিল ঠ্যাঙাড়েপনা, তার পরে আসিল ফাঁস্থড়েগিরি—আরও নূতনতর, সূক্ষ্মতর কিছু চাই। সেই নূতনের সন্ধানে, সূক্ষ্মতরের সন্ধানে রামপণ্ডিতের মন অশান্ত। এও এক রকম তপস্যা।

এমন সময়ে বিন্তি অর্থাৎ বিনোদারাণী পরলোক গমন করিল, পিতার মতো সশরীরে স্বর্গে যাইবার সৌভাগ্য তাহার হইল না। পত্নীর পরলোক গমনে রাম ফাঁস্থড়ে এক প্রকার আনন্দ লাভ করিল, প্রত্যেক পত্নীব্রত স্বামীই এহেন অবস্থায় এহেন আনন্দ পাইয়া থাকে। যদি কেহ বলে যে পায় নাই, তবে হয় সে নিজের গতিবিধি সম্বন্ধে অজ্ঞ, নয় যথেষ্ট পত্নীব্রত নয়। সংসারের গতি অনিশ্চিত, আজ ধনজনমান আছে, পত্নীকে তুমি সুখে রাখিতে সমর্থ হইয়াছ, কাল এ সব না থাকিতেও পারে, তখন ইচ্ছা করিলেও তাহাকে সুখে রাখিতে পারিবে না, এমন ক্ষেত্রে মৃত্যু যদি সেই আশঙ্কা দূর করে, তবে মৃত্যু কেন বাঞ্ছনীয় নয়?

আবার, তুমি বড় দুঃখে আছ, পত্নীকে সুখী করিতে পারিতেছ না, ভবিষ্যতের গর্ভে যে অধিকতর দুঃখ নাই তাহা কে বলিবে? মৃত্যু সেই বিভীষিকাময় সম্ভাবনাকে দূর করিল; এখন বুঝিয়া দেখ এহেন মৃত্যু বাঞ্ছনীয় কিনা!

পুত্র-কন্যা সম্বন্ধে এ মন্তব্য খাটিবে না, কেননা তাহাদের ভবিষ্যৎ তোমার জীবনের সঙ্গে জড়িত নয়—তাহারা তোমা

হইতে উদ্ভূত, কিন্তু তোমার অঙ্গীভূত নয়; আর তোমার স্ত্রীর উদ্ভব স্বতন্ত্র হইলেও সে তোমার অঙ্গীভূত, সে তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী। তাহার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার অন্তর্দ্ধান, যেন তোমারই অর্দ্ধেক অনিশ্চয়তার অবসান। এহেন অবস্থায় অধিকাংশ বুঝমান স্বামীর আশ্বস্ত হওয়া দরকার, তবে যে হয় না, তাহা বুদ্ধির দোষ। সংসারে অধিকাংশ দুঃখের মূলে অনিশ্চয়তা, মৃত্যু সেই অনিশ্চয়তার চরম হন্তারক, তাই মৃত্যুর মতো স্বস্তিজনক আর কি আছে? সংসারে সুখ নাই, কেবল দুঃখ না হইলেই হইল; দুঃখের অভাবই সুখ।

মহামহোপাধ্যায় রামপণ্ডিত একজন শাস্ত্রজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি; সংসারের গতিবিধি, মনের রীতিনীতি সব তিনি জানেন, কাজেই অপরে যখন ভাঙিয়া পড়িত, তিনি আরও চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন; লোকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল, ভাবিল মহাপুরুষগণের স্বভাবই আলাদা।

স্ত্রীর শেষ অনুরোধ ছিল তাহার অস্থি যেন কালীঘাটের গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। তাই শ্রাদ্ধাদি শেষ হইয়া গেলে রাম স্বয়ং পত্নীর অস্থি লইয়া কলিকাতা যাত্রার আয়োজন করিলেন এবং একদিন প্রাতঃকালে ফরাসডাঙ্গাই ধূতি পরিয়া, মেরজাই গায়ে দিয়া, মাথায় ফেটা বাঁধিয়া, পায়ে চীনের জুতা আঁটিয়া, পাল্কী চাপিয়া রাম ফাঁস্থড়ে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বী, সুবে বাংলার বৃহত্তম ডাকাত কোম্পানীর রাজধানীতে যাইতেছে,

অপরে হইলে ভাত হইত, কিন্তু সংসারের রীতিনীতিজ্ঞ রামপণ্ডিতের মন এতটুকু বিচলিত হইল না। তিনি জানিতেন চেহারা ও বেশভূষা দেখিয়া ফাঁস্মুড়ে ধরা যায় না, আর গেলেও তাহাদের কয়েদ করিয়া রাখিবার মতো এত স্থান কোম্পানীর জেলখানায় কোথায়?

সিদ্ধি

রাম ফাঁসুড়ে কালীঘাটে পৌঁছিয়া শাস্ত্রীয় ক্রিয়ামতে স্বর্গতা সহধর্ম্মিণীর অস্থি যথারীতি গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিলেন, আর জলে পড়িবামাত্র যথারীতি তাহা একটি কচ্ছপে গিলিয়া ফেলিল।

তারপরে তিনি স্নান করিয়া কালীমন্দিরে পূজা দিতে গেলেন। পাণ্ডা তাঁহার মুখ দেখিয়া বলিল, বাবু, কালী-মায়ের কাছে হত্যা দিন, আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। পূজারী, পাণ্ডা ও প্রাইভেট টিউটার মুখ দেখিয়া পকেটের ইতিহাস বলিয়া দিতে পারে।

কথাটা রামপণ্ডিতের মনে ধরিল। সারাদিন উপবাসে থাকিয়া সন্ধ্যায় তিনি মায়ের নাটমন্দিরে হত্যা দিলেন এবং শেষ রাত্রে দিব্যকর্ণে শুনিতে পাইলেন মা বলিতেছেন—তুই রূপচাঁদ পক্ষীর কাছে যা, মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

রাম ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন, একি স্বপ্ন, না সত্য, না মাতার আদেশ? অবশ্যই মাতার আদেশ—মাতা কি এমন সুসন্তানকে দীর্ঘদিন উদ্বেগে রাখিতে পারেন।

কিন্তু রূপচাঁদ পক্ষী বা কে, আর তাহার বাসস্থানই বা কোথায়? পাখী হইলে নীড়, মানুষ হইলে বাড়ী—যেমনি হোক কোথায় সেই বস্তু? রাম ফাঁসুড়ে বৌবাজারে এক

গৃহী ভক্তের বাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। ভক্তটি মায়ের আদেশ শুনিয়া বলিল—মহারাজ (এই সম্বোধনটি কেমন স্থিতিস্থাপক, ধনী, সন্ন্যাসী, গৃহী, বিবাগী এবং ফাঁস্থড়ে সকলেরই প্রতি প্রয়োগ করা যায়), আমি রূপচাঁদ পক্ষীকে চিনি।

—পাখী না মানুষ ?

—পাখী হইবে কেন, পক্ষীটা পদবী, স্বোপার্জ্জিত।

—বেশ, এখনি তাহার কাছে চলো।

—চলুন, কাছেই তাহার আড্ডা।

আড্ডা বস্তুটি বাড়ীও নয়, নীড়ও নয় ; বনে হইলে যাহা আশ্রম, লোকালয়ে তাহাই আড্ডা।

তুজনে কয়েক মিনিটের মধ্যেই রূপচাঁদ পক্ষীর আড্ডায় গিয়া পৌঁছিল।

রাম ফাঁস্থড়ে দেখিলেন, একটি জীর্ণ খোলার চালের পাকা বাড়ী, তখনো দরজা বন্ধ।

ভক্তটি দরজায় ধাক্কা দিলে কিছুক্ষণ পরে কৃশকায়, কোটরগতচক্ষু, আজানুলম্বিতবস্ত্র এক প্রৌঢ় ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিল, বলিল—কি চাই ?

ভক্তটি রাম ফাঁস্থড়েকে বলিল—ইনিই রূপচাঁদ পক্ষী।

আর পক্ষীকে বলিল—ইনি আমাদের মহারাজ।

তারপরে পক্ষীকে বলিল—মায়ের আদেশে মহারাজ আপনার কাছে আসিয়াছেন।

পক্ষী বলিল, মায়ের আদেশ না পাইলে কিংবা বাপের তাড়া না খাইলে কেহ আমার আড্ডায় আসে না আমি জানি, কাজেই ও পরিচয় বাহুল্য।

রাম ফাঁসুড়ে তাহার রকম-সকম দেখিয়া শুধাইলেন—আপনি কি মোহান্ত?

—মোহান্ত ছাড়া আর কি? মোহের অন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমার কাছে কেহ আসে না। কাহারো টাকার মোহ, কাহারো বিষয়সম্পত্তির মোহ, কাহারো স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মোহ নাশ হইয়াছে—ঐ দেখুন না কেন, নষ্টমোহের দল কেমন বসিয়া আছে।

এবারে ফাঁসুড়ে ও ভক্তটি অন্ধকারপ্রায় ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিল একদল লোক নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে বসিয়া আছে।

ফাঁসুড়ে শুধাইলেন—ইঁহারা কি ধ্যান করিতেছেন?

—ধ্যান বলিয়া ধ্যান! দেখুন না এই—বলিয়া উবুভাবে উপবিষ্ট একটা লোককে রূপচাঁদ পা দিয়া আঘাত করিল, বলিল—হেই ওঠ, খুব হয়েছে।

সে লোকটা গড়াইয়া পড়িয়া গিয়া মুখে গব্ গব্ শব্দ করিতে লাগিল।

বিস্মিত রাম ফাঁসুড়ে শুধাইলেন, এ আবার কি?

—লোকটা গাড়ুরূপে ভজনা করিতেছিল এবং তন্ময়তার ফলে—

এবারে পক্ষী হাত নাড়িয়া সুর করিয়া বলিল—'মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই।'—বুঝলেন মশাই, গাড়ু, গাড়ু ধ্যান করিতে করিতে ওর গাড়ুজ্ঞান হইয়া গিয়াছে—ও পড়িয়া গিয়াছে যেন গাড়ুটাই পড়িয়াছে, তাই জল পড়িতেছে গব্ গব্।

তারপর পক্ষী বলিল—আরও দেখিবেন, এদিকে আসুন।

এই বলিয়া দুই পায়ের উপরে উপবিষ্ট একটা লোকের কাছে অগ্রসর হইতেই সে একলাফে খানিকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়া 'কড়ড় ঠক্' শব্দ করিয়া পক্ষীর পায়ে ঠোকরাইয়া দিল।

রাম ফাঁস্থড়ের ইতিমধ্যেই কতকটা তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে, শুধাইলেন—ইনি কে?

—ডাক শুনিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না? ইনি কাঠঠোকরা। কাঠঠোকরা-রূপে ইনি ভজনা করিতেছেন, দেখুন না এখনও তন্ময়তার ঘোর কাটে নাই।

তারপরে ফাঁস্থড়ের উদ্দেশে বলিল—আমার এটি যথেচ্ছ-সাধনাশ্রম, নিন্দুকে না জানিয়া বলে গুলির আড্ডা।

এতক্ষণে আড্ডার স্বরূপ অনেকটা প্রকাশ হইয়াছে বুঝিয়া রাম ফাঁস্থড়ে বলিলেন—তাই বলুন।

পক্ষী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—তাই বলুন! কেন, পছন্দ হইল না? এটা টোল পাঠশালা হইলে বড় ভালো হইত, না? যত সব বেল্লিক! তবে বলি শুনুন, এই

সহর কলিকাতার গুলিখোরদের নিয়ম এই যে এক আসরে বসিয়া যে মরদ একশ ছিলিম গুলি খাইতে পারে সে একখানা ইঁট পায়। আমার এই বাড়ী সেইরকম ইঁটে তৈরী, সব আমার একার স্বোপার্জ্জিত। আর সেই রকম ইঁট দিয়া যে বাড়ী তৈয়ারি করিতে পারে সে পক্ষী উপাধি পায়। কলিকাতা সহরে আমি একাই পক্ষী।

তারপরে একটু থুক সারিয়া বলিল—বাগবাজারের চৈতন্য সা হাফ-পক্ষী হবার আগেই চৈতন্যে বিলীন হইল। যে বাড়ীখানা স্বরু করিয়াছিল তাতে এখন ইংরাজী পাঠশালা বসিতেছে। কিসের কি পরিণাম—

ফাঁস্থড়ে শুধাইলেন—আপনার আড্ডার এরা—

—ঐ যে বল্‌লাম, কারো সম্পত্তি নীলাম হইয়া গিয়াছে, জুয়া খেলিয়া কেউ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, কারো বা স্ত্রী পুত্র কন্যা মরিয়াছে, 'যার নাই অন্য গতি, তার নিবাস দ্বারাবতী' —একটু মিলাইয়া দিলাম, অবসর সময়ে কবিদলে উতোর চাপান জোগাইয়া থাকি কিনা!

তারপর একটু থামিয়া বলিল—আর অত ব্যাখ্যাতেই বা দরকার কি? আমি এই সহরে একমাত্র পক্ষী না হইলে মা কি আমার কাছে আসিতে আদেশ দিতেন?

—পক্ষী ব'লে পক্ষী, আপনি একেবারে পক্ষিরাজ!

—মন্দ বলনি হে। তা বলি আসছ কোত্থেকে? চাই কি?

পক্ষী 'আপনি' হইতে 'তুমি'তে নামিয়াছে। গুলির মহিমায় সবই সম্ভব।

রাম ফাঁসুড়ে বলিলেন—একটু নিরিবিলি চাই, আর সময় দরকার।

—সময়? সময় তো আজ হইবে না।

—কেন পক্ষী মহাশয়?

—আজ যে আমাদের বারকোষ যাত্রা আছে।

—বারকোষ যাত্রা! সে আবার কি?

—শোননি?

—আজ্ঞে না। নৌযাত্রা, পাল্কীযাত্রা, শকটযাত্রা পর্য্যন্ত জানি। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বৎসরে একবার রথযাত্রা করেন, আর জীবমাত্রেই একবার করিয়া মহাযাত্রা করে—তাও জানি। কিন্তু বারকোষ যাত্রা তো এপর্য্যন্ত শুনি নাই।

—শুনিবে কি প্রকারে? এর আগে কি পক্ষী দেখিয়াছ? গাছের উপরে বা খাঁচার মধ্যে নয়, মানবদেহ-পিঞ্জরে? তবে?

তারপর বলিল—আচ্ছা, এখন যাও, স্নানাহার করিয়া দ্বিপ্রহরান্তে এখানে আসিও, তখন স্বচক্ষে সব দেখিতে পাইবে, কিছু বুঝাইবার থাকিলে বুঝাইয়া দিব।

এই বলিয়া উপসংহার মাত্র না করিয়া ফাঁসুড়ে ও তাঁহার ভক্তের মুখের উপর সে সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

দ্বিপ্রহরান্তে পক্ষীর আড্ডায় আসিয়া রাম ফাঁসুড়ে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন যে বাঁক

কাঁধে বিশ পঁচিশজন বলিষ্ঠ লোক দণ্ডায়মান, বাঁকের শিকায় একখানি করিয়া বৃহৎ বারকোষ স্থাপিত, আর প্রত্যেক বারকোষের উপরে ভোর-রাত্রের সাধকগণ মিহি ধুতি, চীনের জুতা, গিলা-করা পাঞ্জাবী ও চুনোট চাদর গায়ে উপবিষ্ট। একখানি বারকোষে স্বয়ং পক্ষী ঐরূপ সাজে উপবিষ্ট, অপর দিকের বারকোষখানি খালি।

তাঁহাকে দেখিয়া পক্ষী বলিল—আপনি ঐখানায় বসুন।

—ওখানে কেন?

—নতুবা যাইবেন কি উপায়ে?

—কোথায় যাইব?

—সব বলিতেছি, আগে বসুন।

বসিতেই হইল, মায়ের আদেশে যাহার কাছে আগমন, তাহার বাক্য অন্যথা করা উচিত নয় ভাবিয়া রাম ফাঁস্যুড়ে অপরদিকে বসিবামাত্র "জয় কালী কল্‌কাত্তাওয়ালী" বলিয়া হিন্দুস্থানী বাহকেরা বাঁক ঘাড়ে তুলিল এবং তারপর সারিবদ্ধ ভাবে যাত্রা করিল।

তখন বাঁকের দুই শিকার উপরে দুইজনে দুলিতে দুলিতে চলিতে চলিতে এইরূপ কথোপকথন আরম্ভ হইল—

—বুঝিলেন রামপণ্ডিত মশাই, শোভাবাজারের হাফ-পক্ষীর ছেলের বিয়ে, আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন—আপনাদের জন্য কোন্ যান পাঠাইব; আমি বলিয়া দিলাম, আমরা বারকোষে চড়িয়া যাইব। হাফ-পক্ষী

বড় ভালো লোক, তাই বারকোষ পাঠাইয়াছেন, আর তাই না আমরা যাইতেছি। এবারে বুঝিলেন? নিন, এখন আপনার মনের কথা বলুন। দেখি কি করিতে পারি।

রাম ফাঁস্থড়ে সব নিবেদন করিলেন, বলিলেন, এখন যাহোক একটা উপায় করিয়া দিয়া আমার মনের অশান্তি দূর করুন।

সমস্ত শুনিয়া পক্ষী বলিল, তাহলে আপনিই সেই বহুশ্রুত রাম ফাঁস্থড়ে! যাক, আলাপ হইয়া বড় খুশী হইলাম। কিন্তু আমি যে কিছু করিতে পারিব তা মনে হয় না, কেন না, আমার এ ব্যবসাও আর বেশিদিন চলিবে না। আগে যারা আমার আড্ডায় আসিত, এখন তাদের পুত্রেরা আর এখানে আসে না, ইংরাজী পাঠশালায় ভর্ত্তি হয়। সেখানে যে কি রস পায় তারাই জানে! বুঝিলেন ফাঁস্থড়ে মশাই—ভবিষ্যৎ ওদেরই হাতে। ওরা কিছু করিলেও করিতে পারে। যাইহোক, আপনি চিন্তা করিবেন না, আমার পরিচিত ইংরাজী পাঠশালার এক ছাত্র আছে, এক সময়ে আমার আড্ডার উঠ্‌তি চেলা ছিল, তারপরে তার কি যে মতিগতি হইল, ইংরাজী পাঠশালায় গিয়া ভর্ত্তি হইল। শুনিয়াছি সে বেশ লায়েক হইয়া উঠিয়াছে। কাল সকালে তার কাছে আপনাকে লইয়া যাইব। এখন আসুন—আমরা প্রায় বিয়েবাড়ীতে আসিয়া পড়িয়াছি।

বিবাহ-বাড়ীর কাণ্ডকারখানা খুব লচ্ছিদার কাহিনী, কিন্তু এ গল্পের পক্ষে সম্পূর্ণ অবান্তর, তাই বাদ দিতে বাধ্য হইলাম।

পরদিন বিকালে রূপচাঁদ পক্ষী রাম ফাঁসুড়েকে সঙ্গে করিয়া পটলডাঙ্গায় উমাচরণের বাড়ীতে গেল। উমাচরণের বয়স ত্রিশের কোঠায়। একসময়ে সে পক্ষীর আড্ডায় যাতায়াত করিত, তারপরে ইংরাজী পাঠশালায় ঢোকে—এসব বিবরণ আগেই দিয়াছি। এখন সে গার্ডিনার সাহেবের মুৎসুদ্দি।

উমাচরণ তাহাদের আপ্যায়ন করিয়া বসাইল, পান ও তামাক আনিয়া দিল। তারপরে মনোযোগ সহকারে কতক রূপচাঁদের মুখ হইতে, কতক রামপণ্ডিতের মুখ হইতে তাহাদের আসিবার কারণ শুনিল।

সমস্ত শুনিয়া সে বলিল—রামবাবু, আপনি যথাস্থানেই আসিয়াছেন এবং মায়েরও আপনার প্রতি বিশেষ দয়া। কিন্তু আপনাকে দেশে থাকিলে হইবে না, একেবারে মায়ের পায়ে আসিয়া আশ্রয় লউন—অর্থাৎ এখন হইতে কলিকাতায় বাস করিতে থাকুন।

উমাচরণ বলিতে লাগিল—বাংলা দেশের ঘনীভূত ক্ষীর কলিকাতা সহর, কিন্তু এখনো যথেষ্ট ঘনীভূত হয় নাই, কালক্রমে কলিকাতা সহর বাংলাদেশের চাঁছিতে পরিণত হইবে; অভ্যাস বিশেষের ফলে মানুষের মুখমণ্ডল যেমন

সতত রক্তিমভাব ধারণ করে, ক্রমে ক্রমে কলিকাতা সহরে বাংলাদেশের সমস্ত রুধির আসিয়া সঞ্চিত হইবে, কলিকাতাই বাংলা দেশ। অতএব ইহাই আপনার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র।

তারপরে সে নিজের পরিচয় উপলক্ষে জানাইল—আমার পিতামহ দূর গ্রামাঞ্চলের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিল, কলিকাতায় আসিয়া সে কুড়িটা ইংরাজী শব্দ শিখিয়া লইয়া জনসন সাহেবের মুৎসুদ্দি হয়। তারপরে আমার পিতা দুইকুড়ি ইংরাজী শব্দ শিখিয়া হিকি সাহেবের মুৎসুদ্দি হয়—সাহেব দুগ্‌গুচুরুণ বলিতে অজ্ঞান হইত। আমি যখন গার্ডিনার সাহেবের কুঠিতে প্রবেশ করি ৮০টা ইংরাজী শব্দ জানিতাম, তারপরে আরও উনিশটা শিখিয়াছিলাম, আজ সকালে আমার একশ পূরিয়াছে, আজ শিখিয়াছি একশততম ইংরাজী শব্দ—Bribe! B r i b e মানে ঘুষ, Bribe মানে ঘুষ।

বলিয়া সে কয়েকবার বানান ও অর্থের আবৃত্তি করিল। তারপরে মন্তব্য করিল—ইংরাজিওয়ালাদের হাতেই দেশের ভবিষ্যৎ।

তারপরে উমাচরণ বলিল—আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব, কিন্তু তার আগে এখানে আপনার স্থির হইয়া বসা দরকার—এ তড়িঘড়ির কাজ নয়—এ এক রকম সাধনা, সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

উঠিবার সময় একটি বোতল ও তিনটি গেলাস আসিল এবং জাত্নবিদ্যা ছাড়াই কিছুক্ষণের মধ্যে বোতলের পদার্থ উধাও হইয়া গেল।

উমাচরণের পরামর্শ অনুসারে রাম ফাঁস্থড়ে কলিকাতার বৌবাজার অঞ্চলে একখানি বাড়ী কিনিয়া স্থায়ী হইয়া বসিলেন। দেশের লোকে গ্রামত্যাগ করিবার কারণ শুধাইলে তিনি বলিতেন—সংসারধর্ম্মে আর মন নাই, এবারে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলাম, আমাদের শাস্ত্রেও সেই রকম উপদেশ আছে।

বাস্তবিক একালে বনে যাইতেই যদি হয়, তবে কলিকাতা সহরই প্রশস্ততম স্থান, এমন অরণ্য আর কোথায়? প্রাকৃতিক অরণ্যে পশুর ভয়ে মানুষ ভীত, কলিকাতায় পশুকে চিড়িয়া-খানার লোহার খাঁচায় ভরিয়া রাখিতে হয়, ছাড়া থাকিলে মানুষে তাহাদের আস্ত রাখিত না।

একদিন রামপণ্ডিতের বাড়ী 'রামনিবাসে' বসিয়া উমাচরণ ও রামপণ্ডিতে কথোপকথন হইতেছিল।

উমাচরণ বলিল—আপনার গুরুর ঠ্যাঙ্গা আপনার হাতে ফাঁসের দড়িতে পরিণত হইয়াছে, এবারে ওটাকে অশরীরী রজ্জুতে পরিণত করিয়া ফেলুন।

—কেন ?

—কেন কি! বাঙালী জাতশিল্পী, স্থূলে যেমন অনাদর, সূক্ষ্মে তেমনি আদর। দেখুন না কেন, অন্য প্রদেশের লোকে আটা খায়, ইহারা আটা পিষিয়া সূক্ষ্মতর করিয়া ময়দা খায়। আবার বাংলার গ্রামাঞ্চলের লোকে ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলেই সন্তুষ্ট, কলিকাতার লোকে কলে-ছাঁটা সাদা রঙের সাহেবী চাউল খাইয়া থাকে। অন্য দেশের লোকের হাতে বাঁশের পাকা লাঠি, বাঙালী বাবুর ছড়ি এমন সূক্ষ্ম যে কুকুরেও ভয় পায় না। আপনি ফাঁস দিয়া মারেন তাই আপনাকে আড়ালে ফাঁস্থড়ে বলে, কিন্তু সেই ফাঁস যদি আপনি মনে মনে চালান, তবে লোকে আপনাকে বুদ্ধিমান বলিবে, কত মজলিশে আপনার ডাক পড়িবে, চাই কি লাটসাহেবের দরবারেও আপনাকে যাইতে হইবে।

—আপনার কথা সত্য, কিন্তু উপায়টা কি ?

—ফাঁস্থড়েগিরির মূলে যে প্রবৃত্তি তাহাকে ব্যাপকভাবে সমাজে চালাইয়া দিন।

—কেমন করিয়া ?

—তার আগে বলুন ফাঁস্থড়েগিরির মূলে কোন্ প্রবৃত্তি ?

—নষ্ট করিবার ইচ্ছা।

—বেশ, এবারে এমনভাবে কাজ আরম্ভ করুন যাহাতে নিজের অজ্ঞাতে সমাজ নাশের পথে যায়।

—কিন্তু ব্যাপকভাবে হইবে কি উপায়ে ?

—কেন হইবে না! শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, ব্যবসা ও ধর্ম্ম মোটামুটি এইসব লইয়াই সমাজ গঠিত। কেমন?

—তা বটে।

—এখন ঐসব ক্ষেত্রে আপনার ভাবে ভাবিত লোক যদি অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দেন, তবে তলা হইতে ক্ষইয়া যাইবে, তারপর সময়মতো উপরে একটু ধাক্কা দিলেই ব্যস্—পপাত—

এই বলিয়া উমাচরণ বিধ্বস্ত সমাজের প্রতীকরূপে ফরাসে শুইয়া পড়িল—এবং শুইয়া শুইয়া বলিতে লাগিল, শুনুন, এ দেশে কালে কালে চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি কত তথাকথিত মহাপুরুষই না আসিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে ভয়টা কিসের? দেশ কি তাঁহাদের গ্রহণ করিয়াছে? মোটেই না। দেশ গ্রহণ করিয়াছে জগাইমাধাই, প্রতাপাদিত্য, নন্দকুমার, রায়দুর্লভ, রঘুডাকাত প্রভৃতির আদর্শ। তা যদি না হইত, তবে সমাজে আপনার-আমার মতো লোকের এমন সমাদর হইত কি? ভাবিয়া দেখুন, আপনাকে সকলেই ফাঁস্থড়েশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, কিন্তু কলিকাতার কোন্ বিশিষ্ট লোকটা আপনার বাড়ীতে গিয়া কৃতার্থ বোধ করে নাই? আবার দেখুন, সকলেই জানে যে আমি B-r-i-b-e লইয়া থাকি, এমন কি শব্দটা শিখিবার আগেই বস্তুটা লইতে শিখিয়াছি, অথচ আমি পদার্পণ না করিলে কলিকাতার কোন মজলিশ পূর্ণাঙ্গ হয় না। ইহার অর্থ এই যে, কুপ্রবৃত্তিই

মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, ওরই মধ্যে দুচার জন হাত ফস্কিয়া সাধুসজ্জন হইয়া যায়। পাঁঠার দেহে হাড় আর কয়টা, মাংসই তো বেশি। তবু হাড় না হইলে দেহটা খাড়া থাকে না, কিন্তু তাই বলিয়া হাড়গুলাই খাদ্য নয়। মুষ্টিমেয় সাধুসজ্জন মিলিয়া সমাজটাকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে, সেজন্য তাহারা ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু কেন খাড়া করিয়া রাখিয়াছে ভুলিলে চলিবে না—আমরা ভোজন করিব বলিয়াই।...কই, কিছু আছে নাকি?

রামপণ্ডিতের আদেশে 'কিছু' আসিল—এবং সদ্ব্যবহারেও বিলম্ব হইল না।

তারপরে উমাচরণ বলিল—এখন উঠি, আর একদিন আসিয়া কিভাবে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে তাহার খসড়া করিয়া সব বুঝাইয়া দিব, আপনি বৃথা চিন্তিত হইবেন না।

এই বলিয়া সে তখনকার মতো বিদায় লইল।

কয়েক দিন পরে উমাচরণ 'রামনিবাসে' আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল—কই, আসুন, আজ খসড়া আনিয়াছি।

তারপর রামপণ্ডিতকে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরিকল্পনা ও তৎসংক্রান্ত সমুদায় বিষয় বুঝাইয়া দিয়া বলিল—প্রথমে আপনাকে আপনার ভাবে ভাবিত একদল চতুর দালাল তৈয়ারি করিতে হইবে, তারপরে তাহাদিগকে কতক শিক্ষক-রূপে পাঠশালায় এবং অন্যান্য শ্রেণীর শিক্ষালয়ে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। কতকগুলিকে সাহিত্যরচনায় নিযুক্ত

করিতে হইবে; কতক হইবে রাজনীতিক, এবং কতক ব্যবসায়ী।

—আর ধর্ম্মবিষয়ে নয়?

—সেখানে খুব বেশি চেষ্টা করিতে হইবে না, যাহারা আছে তাহারাই যথেষ্ট, তবু জন কতক ঢুকাইয়া দেওয়া যায়, সাবধানের মার নাই।

—কতদিন লাগিবে?

—অঙ্কুর আপনি দেখিয়া যাইতে পারিবেন, কিন্তু পূর্ণায়ত বৃক্ষ দেখা এক জীবনের কর্ম্ম নয়। কারণ এ হইতেছে বনস্পতি, কিছু সময় লইবে।

গদ্‌গদ্‌ভাবে রামপণ্ডিত বলিলেন—উমাচরণবাবু, আপনি ধন্য।

—তবু তো একশোটার বেশি ইংরাজী শব্দ জানি না। ওসব যাক্‌। আর দেরী নয়, কালীঘাটে যাই।

—কালীঘাটে কেন?

—বাঃ, সঙ্কল্পারম্ভে একবার মাকে পূজা দিবেন না?

—এ উচিত বটে। আজ দিনক্ষণ কেমন?

—এ কাজের জন্য অত্যন্ত প্রশস্ত। শনিবার, অমাবস্যা, ত্র্যহস্পর্শ, মাসান্ত এবং মঘানক্ষত্র।

—চলুন তবে আর দেরী নয়।

তখনই দুইজনে কালীঘাটে যাত্রা করিলেন এবং তথায় যথাশাস্ত্র মাকে পূজা দিয়া যখন মন্দির হইতে বাহিরে আসিলেন তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

তাঁহারা বাহিরে আসিবামাত্র সম্মুখে এক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন—জটাজুট, ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও চিমটা কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী যেমন হয়।

সন্ন্যাসী রামপণ্ডিতের মুখের পানে চাহিয়া বলিল—বৎস, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

রামপণ্ডিত তাহাকে প্রণাম করিয়া শুধাইলেন—প্রভু, কিরূপে জানিলেন?

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল—'দিব্যদৃষ্টির্মে বিদ্যতে।' এবং পাছে বৎস দেবভাষা বুঝিতে না পারে সেই আশঙ্কায় বাংলা করিয়া বলিল, দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে দেখিয়াছি।

—আমরা কি দেখিতে পারি না?

—অবশ্যই পারো, অর্থাৎ কিনা দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে, কেন না, এখনো সে দৃশ্য ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

—দয়া করিয়া আমাদের সেই ভবিষ্যদর্শন দান করুন।

—তবে আমার সঙ্গে এসো।

তখন তিনজনে আদিগঙ্গার তীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সন্ন্যাসী বলিল—কোন উচ্চস্থানে ওঠা আবশ্যক, কিন্তু কই উচ্চ জমি তো এখানে দেখি না।

উমাচরণ বলিল—প্রভু, অদূরবর্ত্তী ঐ গাছটায় উঠিলে কি চলে না?

—অগত্যা উহাতেই হইবে।

তখন তিনজনে সেই গাছটায় আরোহণ করিয়া একটি শাখার উপরে দাঁড়াইলেন। সেটি একটি শ্যাওড়া গাছ।

তারপরে সন্ন্যাসী ছোট একটি কৌটা বাহির করিয়া কাজলের মতো কি একটা পদার্থ তাঁহাদের চোখে মাখাইয়া দিল, বলিল—ইহা জ্ঞানাঞ্জন, তিব্বতে প্রস্তুত, ইহার প্রভাবে মানুষ ভূত, ভবিষ্যৎ, ইহকাল, পরকাল সব প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়।—কিছু দেখিতেছ কি?

বিস্মিত রাম ফাঁস্থড়ে বলিলেন—চতুর্দ্দিকে সুদূরবিস্তৃত ও কি? বাথান নাকি?

সন্ন্যাসী বলিল—ভালো করিয়া দেখ, উহা সার্দ্ধ-একশত বৎসর পরেকার কলিকাতা নগরী, ভারতের বৃহত্তম জন-সমাবেশ। এবারে কি দেখিতেছ?

—পালে পালে গোরু চরিতেছে।

—গোরু নয়, ভালো করিয়া দেখ, ভবিষ্যকালীন কলিকাতার জনসমাজ!

—তাই বটে, মানুষের মতোই বোধ হইতেছে। এখন ঠিক বুঝিতে পারিতেছি।

—অবশ্যই পারিবে। গোরু ও মানুষে প্রভেদ না করিতে পারিলে দিব্যদৃষ্টিই বৃথা। আর ঐ দেখ স্বার্থেশ্বরী কালী-মন্দির, ওখানে দলে দলে লোক ঢুকিতেছে, উহাদের মধ্যে বাদী ও প্রতিবাদী, আসামী ও অভিযোগকারী, চোর ও চোরিত

ব্যক্তি সকল প্রকার লোকই আছে। মাতা সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন বলিয়া উহাদের বিশ্বাস। ঐ ভক্তদের কেহ পরস্বাপহরণ করিতে চায়, বলিতেছে—জয় মা কালী, ধরা যেন না পড়ি। গৃহী বলিতেছে—জয় মা কালী, আমার টাকাকড়ি যেন খোয়া না যায়। পিতা বলিতেছে—জয় মা কালী, ওই বড়লোকের মেয়েটাকে যেন পুত্রবধূ করিতে পারি; পুত্র বলিতেছে—ঐ কালো মেয়ে বিবাহ করিবার আগে হয় ঐ মেয়েটার, নয় আমার পিতার যেন মৃত্যু ঘটে! ঐ শোনো ডাকাতে বলিতেছে—জয় মা কালী, ভাগ দেবো। আবার ঐ শোনো মামলা-জয়ী মক্কেল বলিতেছে—মামলার আগে ভাগ দিব বলিয়াছিলাম সেটা যে পরিহাস, তোমার মতো অন্তর্যামীকে তাহা বুঝাইয়া বলাই অবান্তর; আর এ তো সামান্য মামলা, ঐ বড় মামলাটা জিতাইয়া দাও, তখন যা হয় দেখা যাইবে। ঐ শোনো বৃদ্ধ পতির তরুণী স্ত্রী মনে মনে বলিতেছে—জয় মা কালী, মুখ তুলিয়া চাও, বুড়োটাকে নাও মা, উহার টাকাগুলি হাতে আসুক; তাছাড়া, ও পাড়ার ছোঁড়াটা অনেক দিন হইল পিছে পিছে ঘুরিতেছে, তাহাকে প্রশ্রয় দিলেও আশ্রয় দিতে পারিতেছি না; বুড়াটা অন্তরায়, পথের কাঁটা সরাইয়া লও মা, একদিন জোড়ে আসিয়া জোড়া পাঁঠা দিয়া যাইব মা; সতীনের মৃত্যুসঙ্কল্পে যেমন ফাঁকি দিয়াছিলাম, এবারে তেমন অবাধ্যতা কিছুতেই করিব না।

রাম ফাঁস্থড়ে ও উমাচরণ চীৎকার করিয়া উঠিল—অনেক হইয়াছে প্রভু। অন্যকোন দৃশ্য দেখান।

—ঐ যে উত্তুঙ্গ অট্টালিকার শিরে দাঁড়িপাল্লা অঙ্কিত আছে দেখিতে পাইতেছ ?

—ওটি কি প্রভু ? দাঁড়িপাল্লা যখন, দোকান নিশ্চয়ই, কি বিক্রয় হয় ?

—ওখানে 'ন্যায়' চিহ্নিত উদ্ভিজ্জ ঘৃত বিক্রয় হয় ; উহা গলিত অবস্থায় মণদরে পাইবে, জমাট অবস্থায় গজদরে পাইবে, আর বায়বীয় অবস্থায় বিনামূল্যে পাইবে। তবে তুমি যদি খুচরা খরিদ্দার হও তোমার অস্থবিধার অন্ত নাই, আর পাইকারী হইলে তোমাকে সসম্মানে বসাইবে, চাই কি এক ছিলিম গাঁজাও পাইতে পারো।

তারপরে সন্ন্যাসী আর এক দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল—ঐ দেখ সব বিদ্যালয় বিদ্যায়তন, টোল চতুষ্পাঠী, মক্তব মাদ্রাসা, বুনিয়াদি এবং কাঁচা। ঐ দেখ কাতারে কাতারে ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণী ধাবমান।

রামপণ্ডিত বলিলেন—বিদ্যালাভের কি আগ্রহ !

—আগ্রহ থাকিলেই বা কি। বৎস, এখানেও যে তোমার দালালগণ পুরুষানুক্রমে প্রবেশ করিয়াছে, সব ফোঁপরা করিয়া দিল।

—কি রকম ?

—তাহারা যুক্তি করিয়া কেহ শিক্ষক, কেহ অধ্যাপক, কেহ দপ্তরী, কেহ পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা, কেহ পরীক্ষক, কেহ গভর্নিং বডির সদস্য, কেহ পাঠ্যপুস্তকনির্ব্বাচন কমিটির সদস্য, কেহ উক্ত পুস্তকের প্রকাশক সাজিয়াছে। বাহিরে ভেদ, অন্তরে অন্তরে সব মিল—সবাই একযোগে তোমার আদর্শ প্রচার করিয়া চলিয়াছে। এই আদর্শ গ্রহণ করিয়া যে-সব ছাত্র সংসারে প্রবেশ করিবে তাহারা কী হইবে মনে করো?

—কী হইবে প্রভু?

—দালাল! তোমার আদর্শে উদ্বুদ্ধ! যত দিন যাইবে তোমার আদর্শ তত ঘনতর হইয়া জমিতে থাকিবে; শেষে আর রোদে গলিবে না, আগুনে টলিবে না, হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গের তুষারস্তূপের ন্যায় শাশ্বত হইয়া বিরাজ করিতে থাকিবে।

—আর ওঁরা কারা প্রভু?

—ওঁরা সাহিত্যিক ও শিল্পী এবং চলচ্চিত্রের নটশিল্পী ও প্রযোজক।

—সংখ্যায় যে অনেক!

—হইবে না কেন। বাঙালী যে জাতশিল্পী। ইহাদের অনশনে রাখো, অর্দ্ধাশনে রাখো, ইহাদের স্ত্রীপুত্র, ধর্ম্ম ও বিষয়সম্পত্তি কাড়িয়া লও ইহারা টুঁ শব্দ করিবে না, কিন্তু শিল্পের উপরে হস্তক্ষেপ করো দেখি, অমনি ব্রহ্মাণ্ডলণ্ডভণ্ডকর প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটাইয়া বসিবে!

তারপরে সন্ন্যাসী বলিতে লাগিল—ঐ দেখ উহারা বস্তুতঃ এক হইয়াও প্রয়োজনবোধে দুইদলে বিভক্ত; একদল স্রষ্টা আর একদল সমালোচক। একজন নগ্নচিত্র বা নিরর্থক আঁকজোক আঁকিতেছে আর সমালোচকগণ লাফাইয়া উঠিয়া বলিতেছে—এমনটি আর হয় না, ইহা 'ভবিষ্য শিল্প', তোমরা বুঝিবে না। আর দেখ লোকেও কি আহাম্মক, যে বস্তু যত নিরর্থক সেখানে তত বেশি ভিড় জমাইয়া প্রমাণ করিয়া দিতেছে তাহারা সমজদার ও প্রগতিসম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি!

আর ঐ দেখ সাহিত্যিকগণ!

—এমন গোরু-চোরের মতো চেহারা কেন?

—গোরু-চোর নয়, 'গবেষণা-চোর'; অধিকাংশের কাজ হইল ইংরাজী বই ভুল অনুবাদ করিয়া স্বনামে প্রকাশ। আর সেটুকু জ্ঞানও যাহাদের নাই তাহারা যৌন কেচ্ছা লেখে, আর সমালোচকগণ হাঁকিয়া ওঠে 'বিজ্ঞান, বিজ্ঞান! ইহা না জানিলে জীবন ব্যর্থ!' আবার দেখ উহাদেরই দলের কেহ কেহ সমালোচক সাজিয়া মাসিক পত্রের দপ্তরে বসিয়া আছে, নিজের দলের বই আসিবামাত্র লিখিতেছে 'যুগান্তকারী', অপর দলের আসিবামাত্র লিখিতেছে 'প্রাণান্তকারী।' একদল ফাঁসুড়ের কাজ পথিক ভুলাইয়া বিপথে আনা, অপর দলের কাজ তাহাদের সাবাড় করা—স্রষ্টা ও সমালোচকদের মধ্যেও অনেকটা সেইরূপ সম্বন্ধ, কেবল প্রভেদ এই নিজ দলের প্রশংসা, অপর দলের মুণ্ডপাত।

—প্রভু, লেখক কি নিজের শক্তিতে বরণীয় হয় না ?

—হয় তো হয়, কিন্তু কাহার কত শক্তি কে খবর লইতেছে ? লেখককে বরণীয় করে সম্পাদক, প্রকাশক, সমালোচক ও দপ্তরীতে।

—এবারে চিত্র-শিল্প ও চিত্র-নটনটীদের বিষয়ে কিছু বলুন।

—বৎস, এ যুগে উহাদের বড় প্রতাপ। উহারা আমার মতো সন্ন্যাসীরও হুঁকাকল্কে বন্ধ করিয়া দিতে সক্ষম, তাই উহাদের বিষয়ে কিছু বলিতে চাই না। তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উহাদের আকর্ষণে ঘরে স্ত্রীপুত্র-কন্যা রাখা কঠিন ; কেহ নটনটীরূপে, কেহ দর্শকরূপে বাহির হইয়া যায়।

—আর উহারা কে ? ঐ যে হেঁটমুণ্ডে অনবরত লেখনী চালনা করিয়া যাইতেছে ?

—উহারা অর্থপুস্তক লিখিতেছে।

—সে কি বস্তু প্রভু ?

—যে পুস্তকে বাঘের অর্থ লিখিত হয় 'শার্দ্দূল', 'বৃষ্টি'র অর্থ লিখিত হয় 'আকাশ হইতে পতিত জলধারা বিশেষ' ; ঐ পুস্তক-রূপ গোরুর পুচ্ছ অবলম্বন করিয়া ছাত্রগণ জ্ঞানবৈতরণী অতিক্রম করে—এ পুস্তককে অর্থপুস্তক বলে —উহারা সরস্বতীর গাঁটকাটা।

আর দেখ নির্ভীক সাংবাদিকতা। কাগজ অতিরিক্ত বিক্রয় হইবে আশায় ওখানে নিরন্তর সত্যের নাসাচ্ছেদ

ঘটিতেছে। উহারা যে কেবল সত্যবাদী তাহা নয়, উহারা সত্যস্রষ্টা! উহারা চোরকে চুরি করিতে পরামর্শ দিয়া, গৃহস্থকে সজাগ থাকিতে উপদেশ দিয়া 'কপি' তৈয়ার করিতেছে; এমন সব 'সত্যসংবাদ' ছাপিতেছে যাহাতে গ্রামে গ্রামে লাঠালাঠি লাগিয়া যায়, দেশ দেশান্তরে আগুন জ্বলিয়া ওঠে। উহারা এ যুগের নারদ মুনির পাল।

আর ঐ দেখ Learned Profession-এর আইন-ব্যবসায়িগণ মক্কেলের কাছা গবেষণা করিয়া ফি আদায় করিতেছে!

আর ঐ যে Noble Profession-এর চিকিৎসকগণ হতভাগ্য রুগীকে নিজেদের বেড়াজালে ফেলিয়া সর্ব্বস্ব লুঠ করিতেছে। উহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সব চেয়ে সাধু সে রুগীর প্রয়োজন না থাকিলেও ঔষধের ব্যবস্থা দেয়, একটি ঔষধের প্রয়োজন থাকিলে অন্ততঃ তিনটির ব্যবস্থা দিয়া থাকে।

আরও দেখিবে? তবে দেখ, উহারা বিজ্ঞাপন সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। উহারাই এ যুগের ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ; উহারাই গোপনে সংবাদপত্র চালায়; প্রকাশ্যে ব্যবসা চালায়; পরোক্ষে গ্রন্থকারকে উচ্চ নীচ পদবী দিয়া থাকে; উহাদের বিরুদ্ধে কথাটি বলিয়াছ কি তোমাকে অরণ্যে প্রস্থান করিতে হইবে।

আর ঐ দেখ রাজনীতিকগণ।

—উহারা যে নানা বিভিন্ন দলে বিভক্ত!

—যাত্রাদলের অভিনেতৃগণ যেমন নানা বিভিন্ন সাজে বিভক্ত তাহার বেশি উহাদের ভেদ নহে। রসুনের সবগুলি কোয়া যেমন একই বন্ধনে বদ্ধ উহারাও তেমনি। উহারা মূলতঃ একই দল, তবে নানারূপ সাজ না পরিলে আসর জমে না তাই তাহাদের এইরূপ বহুরূপী পোশাক।

—উহারা বুঝি দেশের জন্য চিন্তা করিয়া থাকে?

—উহারা সকলেই স্ব স্ব পার্টির জন্য চিন্তা করে, দেশের কথা ভাবিবার সময় উহাদের কোথায়? তাছাড়া দেশের নেতারা দেশের জন্য কখনো ভাবে না। বরঞ্চ দেশই কখনো কখনো উহাদের জন্য ভাবিত হইয়া ওঠে।

আর ঐ দেখ সর্ব্বশেষে একদল, তাহারা অন্য কোন ধুয়া না পাইয়া "সাধারণ লোকের জন্য" ধুয়া তুলিয়া সাধারণ লোকের কাছ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া নিজেদের অসাধারণত্ব প্রমাণ করিতেছে!

বৎস, দেখিলে কি? এই তোমার ভবিষ্যতের বাংলাদেশ, যাহা সৃষ্টি করিবার আশায় তুমি সাধনায় বসিতে উদ্যত হইয়াছ। মূর্খ এখানে বিদ্বান্, গুণ্ডা এখানে নায়ক, শঠ এখানে সাধু, চোর এখানে সজ্জন, লম্পট এখানে আদর্শ, ধাপ্পাবাজ এখানে বান্ধব, মাতাল এখানে সংযমী, অর্থপুস্তক-লেখক এখানে পণ্ডিত, রাম ফাঁসুড়ের প্রভাবে এখানে অবিরাম ফাঁসুড়ে, আর এখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে ল্যাং মারিতে উদ্যত।

ফাঁসুড়ে শুধাইলেন—প্রভু, যা দেখিলাম তাহার সবই কি আমার সাধনার ফল?

সন্ন্যাসী বলিলেন—কেবল বীজের প্রাণশক্তিতেই কি বনস্পতি হওয়া সম্ভব? মাটি অনুকূল হওয়া আবশ্যক।

—মাটির অনুকূল অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ অনুগ্রহ করিয়া দান করুন।

—তবে শোনো বৎস! এ পাণ্ডব-বর্জ্জিত, তীর্থযাত্রা বিনা প্রবেশনিষিদ্ধ বাংলা দেশ। বাঙালী-সমাজের আদর্শ কলঙ্কের তিলোত্তমা। এই তিলোত্তমা লাভের উদ্দেশ্যেই ইহারা সুন্দউপসুন্দের মতো লড়িতেছে এবং মরিতেছে। জীবনে যাহা কিছু খণ্ড, ক্ষুদ্র, কুৎসিত, বীভৎস, অমঙ্গলজনক, এককথায় যাহা নঙর্থক দৃষ্টির লক্ষ্যগোচর তাহাই ইহাদের কাম্য! অমাবস্যার চন্দ্রই ইহাদের কাছে যথার্থ পূর্ণচন্দ্র।

—এমন কেন হইল?

—কেন হইল ইহারাই বলিতে পারে। ইহারা ভাঙিতে জানে, গড়িতে পারে না; তাই ইহাদের জীবনক্ষেত্র ক্রমেই শূন্যময় হইয়া পড়িতেছে। ইহারা একাকী কাজ করিতে পারে কিন্তু দশ জনে মিলিয়া কাজ করিতে গেলেই লাঠালাঠি করিয়া বসে। সহস্র বৎসর ধরিয়া পরচ্ছিদ্রান্বেষণ করিতে করিতে অদৃষ্টের পরিহাসে ইহাদের চক্ষুর প্রকৃতি এমনই হইয়াছে যে ছিদ্র ছাড়া আর কিছু দেখিতে পায় না। জীবন ইহাদের কাছে শতচ্ছিদ্র ঝাঁঝরার মতো; ঝাঁঝরায়

রস যতই ঢালো তাহা শতচ্ছিদ্রপথে গলিয়া পড়িয়া যায়, ভোগে লাগে না। ইহারা রস সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু সে রস, ইহাদের জীবনকে পুষ্ট করে না। তাই জীবন ইহাদের মরুভূমি। আর নিজের জীবনের উদাহরণে ইহারা কল্পনা করে যে, সমস্ত মরভূমিটাই মরুভূমি।

ইহারা শ্রদ্ধা করিতে জানে না. তাই কাহারো শ্রদ্ধা পায় না বলিয়াই জগৎটাকেই অশ্রদ্ধেয় মনে করে। তাই ইহাদের কাছে কেহ 'খোট্টা,' কেহ 'মেড়ো,' কেহ 'ছাতু,' কেহ 'উড়ে,' কেহ 'নেড়ে,' কেহবা 'ফিরিঙ্গি দস্যু'! এই অহৈতুক অহমিকার ফলে ইহারা ক্রমে ক্রমে সমগ্র জম্বুদ্বীপের বিদূষকে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের কাছে সবচেয়ে গৌরবের অভিধা 'বাঙালী'। ইহারা মানুষ নয়।

—মানুষ নয়?

—বিস্মিত হইলে কেন? ইহাদের কবিই তো বলিয়াছেন 'রেখেছ বাঙালী করি, মানুষ করনি।' কাজেই বুঝিতে পারিতেছ 'মানুষ' ও 'বাঙালী' ভিন্নার্থক।

—কিন্তু এ দেশে তো অনেক মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন?

—তাঁহারা কাকের বাসায় কোকিলের ছানা। বাংলাদেশের কোলে ভারতের সন্তান।

—ইহারা কি ভারতবর্ষকে স্বীকার করে না?

—খাদ্যের জন্য, অর্থের জন্য এবং সকলপ্রকার বাস্তব সাহায্যের জন্য স্বীকার করে। ইহাদের সবতাতেই ঘাটতি,

বাড়তি কেবল বুদ্ধিতে। এই বুদ্ধিই ইহাদের সর্ব্বনাশের মূল। যে বুদ্ধি মহৎ কর্ম্মের সুযোগ না পায়, সে বুদ্ধি আত্মঘাতী হইয়া দাঁড়ায়। আত্মঘাতী বুদ্ধির ইতিহাসই বাংলাদেশের ইতিহাস। সেকালে এই বুদ্ধির অভিনেতা ছিল বারভুইঞার দল, আর একালে সেই বারভুইঞার সত্তা বারশো ভুইঞা রূপে নিরন্তর হানাহানি, কাটাকাটি, লাঠালাঠি করিয়া মরিতেছে—

—পরিণাম ?

—"পরিণাম রমণীয় !" আর জিজ্ঞাসা করিও না। যা দেখিলে তাহাতে বেশ উল্লাস বোধ করিলে তো ?

—আশাতীত, আশাতীত !—বলিয়া রাম ফাঁসুড়ে আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া শ্যাওড়া গাছ হইতে মাটিতে পড়িয়া আঘাত পাইলেন।

সেই আঘাতের ফলে কয়েক দিবস পরে 'রামনিবাসে' তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়া তাঁহার অমর আত্মা সাধনোচিতধামে চলিয়া গেল।

তাঁহার মৃত্যু হইলে গুণগ্রাহিগণ চিন্তায় পড়িল মহামতি রামপণ্ডিতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কি ভাবে সম্পন্ন হইবে। এমন সময়ে তাঁহার বালিশের তলায় একখণ্ড কাগজ পাওয়া গেল, তাহাতে পণ্ডিতের স্বহস্তে লিখিত ছিল—

"না পোড়াইও রাম-অঙ্গ, না ভাসাইও জলে—
মরিলে বান্ধিয়া রেখো তমালেরি ডালে।"

উহা পড়িয়া সকলে ভক্তিতে গদ্‌গদ্ চিত্তে বলিয়া উঠিল—উনি 'রাধাভাবে' দেহত্যাগ করিয়াছেন, উঁহার শেষ ইচ্ছা রাখিতেই হইবে। কিন্তু তমালগাছ কোথায়? একজন বলিল, অভাবে তালগাছ চলিতে পারে, কারণ 'তাল তমাল' একত্র ব্যবহৃত হয়, তাছাড়া তমালের 'ম' ছাড়িলেই তাল। তখন সকলে খোল করতাল বাজাইয়া রামপণ্ডিতের নশ্বর দেহ নিকটবর্ত্তী এক তালগাছে ঝুলাইয়া রাখিয়া দিল।

মৃত্যুর পরেও রাম ফাঁস্বড়ের ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল না। পরদিন পুলিশ আসিয়া রামপণ্ডিতকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিল, কে বা কাহারা ইঁহার অপমৃত্যু ঘটাইয়াছে। ঐ অভিযোগের তদন্তচ্ছলে পাড়ার লোকের প্রাণান্ত ঘটাইয়া সার্থক পুলিশ-বাহিনী থানায় ফিরিয়া গেল—আর মহামতি পূর্ব্ব-কথিত তালবৃক্ষে উর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে দোদুল্যমান অবস্থায় স্বকীয় আদর্শের সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তপস্যা করিতে করিতে সাধনার ঘটিকাযন্ত্রের পেণ্ডুলামের মতো বায়ুভরে তালে তালে দুলিতে থাকিলেন।

ইহাই মহামতি রাম ফাঁস্বড়ের জীবনের ও সাধনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আমরা যথাসাধ্য বর্ণনা করিলাম, এখন এই কাহিনী পড়িয়া এ দেশের ঘরে ঘরে রাম ফাঁস্বড়ে জন্মগ্রহণ করুক ইহাই দীন গ্রন্থকারের আশা।—

মহামতি রাম ফাঁস্থড়ে

যে শুনিবে এই কথা জানিহ নিশ্চয়
চৌর্য্যে তার চুরি বলি না হবে সংশয়।
ভালোরে সে মন্দ বলি পারিবে বুঝিতে
সত্য মিথ্যা ল'য়ে তার না হবে যুঝিতে।
গাঁটকাটা সিঁধকাটা মাথাকাটা আর
নিতান্ত সহজ হবে সম্মুখে তাহার।
সে বুঝিবে মিথ্যা এই জগৎ মাঝারে
সত্য বলে কোন বস্তু থাকিতে না পারে।
গড়ের মাঠের মতো চিত্ত হবে তার
চৌঘুড়ি চলিবে সেথা ধাপ্পা, শঠতার।
অধিক বলিব কিবা, দেখ চারিধার
বহুরূপে ফাঁস্থড়ে সে সম্মুখে তোমার।
রামকৃষ্ণ শ্রীরবীন্দ্র এবং স্বামীজি
বঙ্কিম প্রভৃতি স্মরি চক্ষু ওঠে ভিজি।
তবুও থাকুন তাঁরা মাথার উপরে
রাম ফাঁস্থড়ে সে জাগে সতত অন্তরে।
বাঙালীর বক্ষ যদি করহ বিদার
দেখিবে জাগিছে সেথা ফাঁস্থড়ে উদার।
বদন ভরিয়া সবে বলো ধন্য ধন্য
ফাঁস্থড়ে শিক্ষায় মোরা শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য।
রাম ফাঁস্থড়ের কথা অমৃতসমান
ফাঁসিরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান্॥

—সমাপ্ত—

ঃ লেখকের অন্যান্য বই ঃ

রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ ১, ২
রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ ১, ২
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন
মাইকেল মধুসূদন
নেহরু, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

বাংলার লেখক
বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য
বাংলা সাহিত্যের নরনারী
বাঙালীর জীবনসন্ধ্যা
চিত্র-চরিত্র
বিচিত্র উপল
বিদ্যাসুন্দর

উত্তরমেঘ
হংসমিথুন
অকুন্তলা
যুক্তবেণী
দেয়ালি
বসন্তসেনা
আত্মঘাতিনী
প্রাচীন গীতিকা হইতে
প্রাচীন আসামী হইতে

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার
অশ্বত্থের অভিশাপ
চলন বিল
কোপবতী
পদ্মা
প্র. না. বি.-র নিকৃষ্ট গল্প
প্র. না. বি.-র নিকৃষ্টতর গল্প
ধনেপাতা
দেশের শত্রু
পারমিট
ঋণং কৃত্বা
সানি ভিলা (ঘৃতং পিবেৎ)
মৌচাকে ঢিল
ডিনামাইট
পরিহাসবিজল্পিতম্
গভর্ণমেণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টার
শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব
শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব
গালি ও গল্প
গল্পের মতো
অশরীরী
ডাকিনী
ব্রহ্মার হাসি







